নীতিশিক্ষা

আখ্যানমালা

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্তপ্রণীত।

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬

মূল্য ছয় আনা।

নীতিশিক্ষা

আখ্যানমালা

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্—বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্—বীণাযন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩

বিজ্ঞাপন।

বালকদিগের নীতিশিক্ষার উপযোগী কতিপয় বিষয়ের নির্ব্বাচন পূর্ব্বক নীতিশিক্ষা আখ্যানমালা প্রচারিত হইল।

বিদেশীয় লোকের আখ্যানপাঠ অপেক্ষা, স্বদেশীয় লোকের আখ্যানপাঠে, আত্মাদর, আত্মসম্মান ও আনুষঙ্গিক নীতিজ্ঞান দৃঢ়তর হয়। আখ্যানমালায় ভারতের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরুষ ও রমণীদিগের, মহানুভাবতা, পরোপকারিতা, সহিষ্ণুতা ও রাজভক্তিপ্রভৃতির বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। বালকদিগের নীতিজ্ঞানশিক্ষাবিষয়ে, এই সকল বিবরণ, কিয়দংশে ফলোপধায়ক হইতে পারে।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

কলিকাতা,

১লা আশ্বিন, ১২৯৬।

সূচী।

নীতিশিক্ষা
আখ্যানমালা

মহানুভাবতা।

রাজস্থানের মিবার-ভূমি, যথার্থ বীরকুল-প্রসবিনী। মিবারের রাণা কুম্ভ, যথার্থ মহানুভাব বীরপুরুষ। শত্রুর রাজ্যে যে কোন প্রকারে বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দেওয়াই, প্রকৃত বীরত্বের লক্ষণ নহে, দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়া, যেখানে সেখানে তরবারির আস্ফালন করাও প্রকৃত বীরত্বের পরিচয় নহে, ন্যায় ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের স্বাধীনতা হরণ করাও প্রকৃত বীরত্বের চিহ্ন নহে। যখন দেখিব, কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তি, একটি বলিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া, গোপনে নিরস্ত্র বিপক্ষকে সংহার করিতেছে, অসময়ে, অতর্কিতভাবে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, সর্ব্বত্র আতঙ্কের বিস্তারে উদ্যত হইতেছে, ন্যায়ের গভীর উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া, নরশোণিত-স্রোতে চারি দিক রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে, তখন আমরা তাহাকে প্রকৃত বীরপুরুষ না বলিয়া গোঁয়ার ও ক্রূর, সাধুজনের এই বিগর্হিত বিশেষণে

বিশেষিত করিব। প্রকৃত বীরপুরুষ কখন এমন হীনতা দেখাইতে অগ্রসর হন না। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা উচ্চ-ভাবে পূর্ণ থাকে। তিনি যুদ্ধস্থলে যেমন বীরত্বের পরিচয় দেন, অন্য সময়ে তেমনি কোমলতা দেখাইয়া, সকলকে সম্প্রীত করিতে থাকেন। কিছুতেই তাঁহার সাধনা বিচলিত হয় না, এবং কিছুতেই তাঁহার মহত্ত্ব, হীনতার পঙ্কে ডুবিয়া যায় না। ঘোরতর বিঘ্নবিপত্তি উপস্থিত হইলেও, আপনার অভীষ্টসাধন জন্য, তিনি কখনও ন্যায় ও ধর্ম্মের অবমাননা করেন না। প্রকৃত বীরপুরুষ সর্ব্বদা সংযতভাবে আপনার পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে তৎপর থাকেন। মিবারের রাজপুতগণ এইরূপ বীরপুরুষ ছিলেন। ইহাঁরা যেরূপ বীরত্ব ও মহানুভাবতা দেখাইয়া গিয়াছেন, অপরে তাহা দেখা-ইতে পারেন নাই।

কৃতজ্ঞতা, আত্মসম্মান ও বিশ্বস্ততা, রাজপুত-বীরের সমুদয় ধর্ম্মের ভিত্তি। এক জন রাজপুতকে জিজ্ঞাসা কর, পৃথিবীর মধ্যে সকলের অপেক্ষা গুরুতর পাপ কি? সে তখনি উত্তর করিবে যে, "গুণচোর" ও "সৎচোর" হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। অকৃ-তজ্ঞ ব্যক্তির নাম "গুণচোর", আর অবিশ্বস্তের নাম "সৎচোর।" যে গুণচোর ও সৎচোর হয়, রাজপুতের মতে, সে যম-রাজ্যে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া

থাকে। এ স্থলে মিবারের এইরূপ বীরপুরুষের পবিত্র চরিত্রের কথা বিবৃত হইতেছে। বীরত্বের রুদ্র মূর্ত্তি ও মাধুর্য্যের কমনীয় কান্তি, কিরূপে একাধারে অবস্থিতি করে, তাহা এই কথায় জানা যাইবে।

প্রথমে রাণা কুম্ভের পবিত্র চরিত্রের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। কুম্ভ ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাহসে, পরাক্রমে ও শাসন-দক্ষতায় এই ক্ষত্রিয় বীর, মিবারের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। কুম্ভ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, মিবারের সিংহাসনে থাকিয়া, অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু তিনি চিরকাল শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। দেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য তাঁহাকে পরাক্রান্ত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। খিলজীবংশীয় রাজাদিগের পরাক্রম খর্ব্ব হইয়া আসিলে, কয়েকটি মুসলমান রাজ্য দিল্লীর অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া, স্বাধীন হয়। ঐ সকলের মধ্যে মালব ও গুজরাট প্রধান ছিল। কুম্ভ যখন মিবারের সিংহাসন গ্রহণ করেন, তখন ঐ দুই প্রদেশের অধিপতি বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই দুই ভূপতি একত্র হইয়া, বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত মিবার আক্রমণ করেন। কুম্ভ এক লক্ষ সৈন্য ও চৌদ্দ শত হস্তী লইয়া, স্বদেশ-রক্ষায় প্রস্তুত হন। মিবারের প্রান্ত ভাগে মালবরাজ্যের

বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই মহাযুদ্ধে বিপক্ষদিগের পরাজয় হয়, বীরভূমি মিবারের স্বাধীনতা অটল থাকে। মালবের অধিপতি শেষে কুম্ভের বন্দী হন। এই সময়ে মহাবীর কুম্ভের পবিত্র চরিত্রের সৌন্দর্য্য বিকাশ পায়। কুম্ভ পরাজিত শত্রুর প্রতি অসৌজন্য দেখাইলেন না। তিনি বীরধর্ম্ম ও বীরপদ্ধতি অনুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বিজয়-লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের আশায়, অতুল পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, শেষে বিজয়ী হইয়া সেই বীর-ধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না। কুম্ভ প্রকৃত বীর-পুরুষের ন্যায় পরাজিত ও পদানত শত্রুর সম্মান রক্ষা করিয়া, মহানুভাবতার পরিচয় দিলেন। তিনি মালব-রাজকে কেবল বন্দীর অবস্থা হইতে মুক্ত করিলেন না, প্রত্যুত অনেক ধনসম্পত্তি দিয়া, স্বরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। রাজপুত বীরের এইরূপ অসামান্য চরিত্র-গুণ সকলের শিক্ষার বিষয়।

মিবারের অধিপতি রায়মল্লের চরিত্রও অসাধারণ ভাবে পূর্ণ। এই অসাধারণ ভাব মিবারের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। যদি মহানুভাবতার কোন মহৎ উদ্দেশ্য থাকে, বংশের পবিত্রতার রক্ষার জন্য, যদি কোনরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞা থাকে, প্রকৃত বীরত্বের

নিদর্শনস্বরূপ যদি হৃদয়ের কোনরূপ তেজস্বিতা থাকে, তাহা হইলে, মিবারের রায়মল্ল প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ মহৎ উদ্দেশ্য রক্ষা করিয়াছেন, ঐরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞা দেখাইয়াছেন, এবং ঐরূপ তেজস্বিতার বলে আপনার বীরত্বের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন দিমস্থিনিস্* অদ্বিতীয় বাগ্মী না হইতে পারেন, বাল্মীকি অদ্বিতীয় কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ না করিতে পারেন, হাউয়ার্ড† অদ্বিতীয় হিতৈষী বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত না হইতে পারেন, কিন্তু রায়মল্ল তেজস্বীদিগের মধ্যে অদ্বিতীয়। রায়মল্লের ন্যায় কেহই আপনার লোকাতীত মহাপ্রাণতা দেখাইতে পারেন নাই, রায়-

* দিমস্থিনিস্ গ্রীশ দেশের সর্ব্বপ্রধান বক্তা। ইহার পিতা এথেন্সনগরে তরবারির ব্যবসায় করিতেন। খ্রীষ্টের ৩৮০ বৎসর পূর্ব্বে দিমস্থিনিসের জন্ম হয়। শৈশবকালে পিতৃহীন হওয়াতে দিমস্থিনিস প্রথমে ভালরূপ লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। সতর বৎসর বয়সে তিনি বক্তৃতার প্রণালী শিখিতে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে এ বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা পরিস্ফুট হয়। ক্রমে তিনি প্রাচীন সময়ে অদ্বিতীয় বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

† জন হাউয়ার্ড ১৭২৬ খ্রীঃ অব্দে ইঙ্গলণ্ডের অন্তঃপাতী হাক্নে নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিকম্পে লিসবন নগরের কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল, তাহা দেখিবার জন্য হাউয়ার্ড ১৭৫৬ অব্দে তথায় যাইতেছিলেন, ঘটনাক্রমে তাঁহাদের জাহাজ ফ্রান্সে নীত হয়। হাউয়ার্ড ফরাসীদেশের কারাগারে অবরুদ্ধ হন। কারাগারের দূষিত প্রণালীপ্রযুক্ত এই সময়ে

মল্লের ন্যায় কেহই আপনার মহত্ত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই। জগতের ইতিহাসে, আজ পর্য্যন্ত, এরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই। রোমের ব্রুতস্* অপরাধী পুত্রকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিয়া, জগতের সমক্ষে স্বার্থত্যাগ ও ন্যায়বুদ্ধির মহান্ ভাব দেখাইয়াছেন, মিবারের রায়মল্ল, অপরাধী পুত্রের হত্যা-কারীকে পুরস্কৃত করিয়া, উহা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ ভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

কয়েদীদিগকে যাতনার একশেষ ভুগিতে হইত। হাউয়ার্ডকেও এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এই অবধি হাউয়ার্ড কারালয়ের দূষিত প্রণালীর সংস্কার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি মুক্তিলাভ করিয়া, স্বদেশে আসিয়া এ বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করেন। হাউয়ার্ড ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরের কারাগার দেখিয়া, কয়েদীদিগের অবস্থার বর্ণনা করেন। তিনি লোকহিতৈষী ছিলেন। সংক্রামক রোগাক্রান্তদিগকেও নিজে দেখিতে ত্রুটি করিতেন না। এক সময়ে হাউয়ার্ড একটি সংক্রামক জ্বররোগীকে দেখিতে গমন করেন। ইহাতে তাঁহারও ঐ রোগ জন্মে। উহাতেই ১৭৯০ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

* ব্রুতস্, রোমের প্রধান মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। রোমে সাধা-রণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রুতস্ ও কলেতিনস্, উভয়েই প্রধান মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। ইঁহাদের উপাধি "কন্সল" হয়। এই সময়ে রোমের সাধারণতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য অনেকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ইহাদের মধ্যে ব্রুতসের দুই পুত্র এবং কলেতিনসের তিন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। প্রধান মাজিষ্ট্রেটের নিকট ইঁহাদের বিচার হয়। কলেতিনস্ ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত অপেক্ষাকৃত লঘু দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রুতস্

চারি শত বৎসরের অধিক কাল হইল, বীরভূমি রাজপুতনার একটি লাবণ্যবতী কুমারী অশ্বারোহণে কোন স্থানে যাইতেছিল। অশ্বারোহিণীর যুদ্ধবেশ। ঐ বেশে বালিকা অকুতোভয়ে তীরবেগে অশ্বচালনা করিতেছিল। বালিকার সে সময়ের ভীষণ ও মধুর মূর্ত্তি চারি দিকে একটি অপূর্ব্ব প্রভার বিকাশ করিতেছিল। দূর হইতে একটি ক্ষত্রিয় যুবক এই মোহিনী কান্তি দেখিতে পাইলেন। এই যুবকও অশ্বারূঢ় ও যুদ্ধবেশধারী। অশ্বারোহী যুবক, অশ্বারোহিণীর অশ্বচালনা-কৌশল দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এই যুবক, মিবারের মহারাজ রায়মল্লের কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল্ল। আর বিদ্যুৎ-চঞ্চল অশ্বের আরোহিণী, টোডার অধিপতি রাও সুরতনের কন্যা তারাবাই। রায়মল্লের পুত্র, এই যুদ্ধবেশধারিণী ক্ষত্রিয়কুমারীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

মহারাজ রায়মল্লের পুত্র তারাবাইর পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইলেও, রাও সুরতন সহসা তাঁহার আশা পূর্ণ করিলেন না। লিল্লানামে এক জন পাঠান রাও সুরতনকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া টোডা অধিকার করিয়াছিল। সুরতন নিষ্কাশিত হইয়া, কন্যা-

আপনার পুত্রদিগের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়া অপক্ষপাতিতার পরিচয় দেন।

রত্নের সহিত মিবার রাজ্যের অন্তর্গত বেদনোরে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। সুরতনের প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি বাহুবলে টোডা অধিকার করিতে পারি-বেন, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—তারাবাই তাঁহারই করে সমর্পিতা হইবেন। এ প্রতিজ্ঞা রাজপুতের উপযুক্ত। যাঁহারা বসুন্ধরাকে বীরভোগ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এ প্রতিজ্ঞাবাক্য সেই বীরপুরুষদের মুখেই শোভা পায়। জয়মল্ল, রাও সুরতনের দুহিতা-রত্নের অভিলাষী হইয়া, টোডা অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। পাঠানের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু জয়মল্ল, সুরতনের কথা রাখিতে পারিলেন না। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পাঠানের পরাক্রম পরাভূত হইলেও, রাজপুত-কলঙ্ক লজ্জিত হইলেন না। তাঁহার হৃদয়ে তারার মোহিনী মূর্ত্তি জাগিয়াছিল, তিনি পরাজিত হইলেও, অম্লানভাবে বেদনোরে আসিয়া, সেই লাবণ্যময়ী কুমারীকে অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। এ অপমান রাও সুরতন সহিতে পারিলেন না। রাজপুতের হৃদয় উত্তেজিত হইল। এ উত্তেজনা অমনি তিরোহিত হইল না। রাও সুরতন, জয়মল্লকে হত্যা করিয়া আপনার বংশের সম্মান রক্ষা করিলেন। রাজ-পুতের অসি রাজপুত-কলঙ্কের শোণিতে রঞ্জিত হইল।

ক্রমে মিবারে এ সংবাদ পঁহুছিল। ক্রমে মিবারের

গৃহে গৃহে এ সংবাদ লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। রায়মল্লের পুত্রের শোণিতে রাও সুরতনের হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছে, সকলেই ভাবিতে লাগিল, আর সুরতনের পরিত্রাণ নাই। রায়মল্লের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ সহোদরের পরাক্রমে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন, দ্বিতীয় পুত্র ঔদ্ধত্যপ্রযুক্ত পিতার আদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, কেবল এক জয়মল্লই পিতার হৃদয়-রঞ্জন ছিলেন। সেই হৃদয়-রঞ্জন কুসুম বৃন্তচ্যুত হইল। এই নিদারুণ শোকের আঘাতে রায়মল্ল অধীর হইবেন। মিবারের রাজপুতেরা ইহা ভাবিয়া, ম্রিয়মাণ হইল। কথা আর দীর্ঘকাল গোপনে রহিল না, অবিলম্বে উহা মহারাজ রায়মল্লের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। রায়মল্ল ধীরভাবে সমস্ত শুনিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার ধীরতার ব্যতিক্রম হইল, অকস্মাৎ তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত ও নেত্রদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল। প্রাণাধিক পুত্রের শোচনীয় পরিণামে, তিনি কাতর হইলেন না। রায়মল্ল অকাতরে বজ্রগম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "যে কুলাঙ্গার পুত্র, পিতার সম্মান নষ্ট করিতে উদ্যত হয়, তাহার এইরূপ শাস্তিই প্রার্থনীয়। সুরতন কুলাঙ্গারকে সমুচিত শাস্তি দিয়া ক্ষত্রোচিত কার্য্য করিয়াছেন।" মহারাজ রায়মল্ল, ইহা কহিয়া, পুত্রহন্তা রাও সুরতনকে পুরস্কারস্বরূপ বেদনোর রাজ্য সমর্পণ করিলেন।

স্বদেশানুরাগ।

১৫৬৮ খ্রীঃ অব্দে পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট্ আকবর শাহ যখন চিতোর নগর আক্রমণ করেন, চিতোরের প্রধান সেনাপতি জয়মল্ল যখন আকবর-হস্তে নিহত হন, ষোড়শবর্ষীয় পুত্ত যখন অসীম উৎসাহে শত্রুর সম্মুখে আইসেন, তখন বীরভূমি চিতোরের তিনটি বীরাঙ্গনা, স্বদেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কোমল দেহে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া, কোমল হস্তে কঠোর অস্ত্র ধরিয়া, মোগলসেনার গতিরোধ করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন।

পরাক্রান্ত জয়মল্ল স্বর্গে গিয়াছেন। অকস্মাৎ পুরুষ-সিংহ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। মোগল, চিতোরের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে একটি বীরবালক যুদ্ধে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। জয়মল্ল জন্মের মত চিতোর হইতে বিদায় লইয়াছেন, তাঁহার অভাবে চিতোর শূন্য হইয়াছে; পুত্ত এই শূন্য স্থান পূরণ করিলেন। পুত্তের বয়স ষোল বৎসর। বয়সে তিনি বালক, কিন্তু সাহসে, বিক্রমে ও ক্ষমতায়, তিনি বর্ষীয়ান্ পুরুষ। পুত্ত, মাতার নিকট বিদায় লইলেন। কর্ম্মদেবী আশ্বস্ত-হৃদয়ে প্রিয়তম পুত্রকে যুদ্ধ-স্থলে যাইতে কহিলেন। পুত্ত, প্রিয়তমার নিকট গেলেন, কমলাবতী প্রফুল্ল-

হৃদয়ে প্রাণাধিক স্বামীকে বিদায় দিলেন; ভগিনী কর্ণ-বতী জন্মভূমির রক্ষার নিমিত্ত সহোদরকে উত্তেজিত করিলেন। ষোড়শবর্ষীয় বালক—চিতোরের অদ্বিতীয় বীর, জন্মের মত বিদায় লইয়া, অসীম উৎসাহে পবিত্র কার্য্য সাধনের জন্য পবিত্র ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। মোগল-সেনা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। আকবর এক ভাগের সেনাপতি হইয়াছিলেন; অন্য ভাগ আর এক জন বিচক্ষণ যোদ্ধার অধীনে ছিল। দ্বিতীয় দলের সহিত পুত্তের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সম্রাট্ অপর দিক হইতে পুত্তকে বাধা দিবার জন্য, আসিতে লাগিলেন।

বেলা দুই প্রহর। এই সময়ে সহসা আকবরের সৈন্য যুদ্ধস্থলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল; তাহারা পুত্তের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সহসা তাহাদের গতিরোধ হইল। সম্মুখে সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম; গিরিবর্ত্মের পুরো-ভাগে দুই একটি শ্যামল পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ। ঐ বৃক্ষের পশ্চাভাগ হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া, মোগল-সৈন্যের ব্যূহভেদ করিতে লাগিল। মোগলেরা স্তম্ভিত হইল। এ দিকে অনবরত গুলি আসিতেছিল। অনবরত গুলির আঘাতে সৈন্যগণ রণভূমির ক্রোড়-শায়ী হইতেছিল। আকবর সবিস্ময়ে দেখিলেন, তিনটি বীরাঙ্গনা গিরিবর্ত্ম আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান

হইয়াছে। একটি বর্ষীয়সী, আর দুইটি, ঈষৎ উদ্ভিন্ন কমলদলের ন্যায় অপূর্ণযুবতী। তিনটিই অশ্বে আরূঢ়, তিনটিই দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত, তিনটিই অস্ত্রচালনায় সুদক্ষ। মধুরতার সহিত ভীষণতার এইরূপ সংমিশ্রণ দেখিয়া, আকবরের হৃদয় বিচলিত হইল। এই তিনটি বীরাঙ্গনার পরাক্রমে তাঁহার বহুসংখ্য সৈন্য রণস্থলে দেহত্যাগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া, ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ ক্ষোভে ও লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

এ দিকে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। তুমুল যুদ্ধে কর্ম্মদেবী, কমলাবতী ও কর্ণবতী, আপনাদের লোকাতীত পরাক্রম দেখাইতে লাগিলেন। ষোড়শবর্ষীয় পুত্ত—স্নেহের একমাত্র অবলম্বন, প্রবল শক্রর সহিত একাকী যুদ্ধ করিবে, ইহা কর্ম্মদেবী স্থিরচিত্তে দেখিতে পারেন না; প্রিয়তম স্বামী—পবিত্র প্রেমের অদ্বিতীয় আস্পদ, একাকী শক্রর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইবে, একাকী গরীয়সী জন্মভূমির জন্য প্রাণত্যাগ করিবে, ইহা কমলাবতী প্রাণ থাকিতে সহিতে পারেন না; ভালবাসার ও প্রীতির আশ্রয়ভূমি সহোদর, পবিত্র কার্য্যের জন্য দেহ ত্যাগ করিবে, ইহা কর্ণবতী নীরবে দেখিতে পারেন না। পুত্ত, মোগলসৈন্যের এক দল আক্রমণ করিয়াছেন; আকবর আর এক দল লইয়া, পুত্তের

বিরুদ্ধে যাইতেছেন; কর্ম্মদেবী, কমলাবতী ও কর্ণবতী, হঠাৎ ঐ সৈন্যদলের গতিরোধ করিলেন।

এক দিকে ষোড়শবর্ষীয় পুত্ত, আর এক দিকে তাঁহার বর্ষীয়সী জননী এবং অপূর্ণবয়স্কা প্রণয়িনী ও সহোদরা। চিতোরের বীর্য্য-বহ্নির এই তিনটি উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ, দিল্লীর সম্রাটের সৈন্য ছারখার করিতে উদ্যত। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তিনটি বীরাঙ্গনার গুলির আঘাতে মোগলসৈন্য নষ্ট হইতে লাগিল। দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল; বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনা, দুরন্ত শত্রুর গতিরোধ করিয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন। ইঁহাদের অস্ত্র-চালনায় অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। আকবর প্রকৃত বীরপুরুষ। তিনি এই তিন বীরাঙ্গনার বীরত্বে মোহিত হইলেন। এই বীরত্বের যথোচিত সম্মান করিতে, তাঁহার আগ্রহ জন্মিল। তিনি ঘোষণা করিলেন, যে, এই বীরাঙ্গনা তিনটিকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে বহু অর্থ পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। কিন্তু সকলে তখন যুদ্ধে উন্মত্ত ছিল, সম্রাটের এ কথায় কোন ফল হইল না। মোগলেরা জ্ঞানশূন্য হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তিনটি বীররমণী, অসীম সাহসে তাহাদের আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন। সহসা কর্ণবতীর শরীর অবশ হইল, সহসা

কর্ণবতী বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় ভূতলে পতিত হই-লেন। কর্ম্মদেবীর দৃক্‌পাত নাই; প্রাণাধিক দুহিতাকে ভূতলশায়িনী দেখিয়াও, কর্ম্মদেবী কাতর হইলেন না। অকাতরে,অবিচলিতহৃদয়ে, তিনি শত্রুপক্ষের উপর গুলি-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে, বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি গুলি আসিয়া, কমলাবতীর বাম হস্তে প্রবেশ করিল। ভীষণ আঘাতে কমলাবতী, প্রথমে টলিলেন না, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া, শত্রুর সৈন্য নষ্ট করিতে লাগি-লেন। মোগলেরা উন্মত্ত, গুলির উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। যখন কমলাবতী ও কর্ম্মদেবী, উভয়ে ভূতল-শায়িনী হইলেন, তখন পুত্ত, সম্রাটের সৈন্য পরাজিত করিয়া, গিরিবর্ত্মের নিকট আসিলেন। তাঁহার আরাধ্যা জননী, প্রিয়তমা প্রণয়িনী ও প্রাণাধিকা সহোদরার দেহ, যুদ্ধ-স্থলে বিলুণ্ঠিত হইতেছিল। পুত্ত, ইহা দেখি-লেন। এ দিকে কমলাবতী ও কর্ম্মদেবীর বাক্‌রোধ হইয়া আসিতেছিল। পুত্ত বাহু প্রসারিয়া, ইঁহাদিগকে তুলিয়া লইলেন। কমলাবতী ধীরভাবে প্রাণকান্তের দিকে চাহিলেন,ধীরভাবে পতিপ্রাণা, সাধ্বী সতী প্রাণেশ্বরের বাহুমূলে মাথা রাখিয়া,অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কর্ম্মদেবী প্রিয়তম পুত্রকে আবার যুদ্ধ করিতে কহি-লেন, এবং তাঁহাদের সহিত স্বর্গে আসিতে অনুরোধ করিয়া, ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন। পুত্ত মুহূর্ত্ত-

কাল চিন্তা করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ভীষণ "হর হর" রবে শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহু ক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, ষোড়শবর্ষীয় বীর, জন্মভূমির ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হইলেন। পুত্তের দেহ তদীয় প্রণয়িনীর সহিত এক চিতায় দগ্ধ করা হইল। কর্ম্মদেবী ও কর্ণবতীর দেহ আর এক চিতায় শায়িত হইল। ইঁহারা অমরলোকে গমন করিলেন। ভূলোকে ইঁহাদের অনন্ত কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিল।

আকবর, জয়মল্ল ও পুত্তের দুইটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া, দিল্লীর দুর্গদ্বারের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়, দুইটি প্রকাণ্ডকায়, প্রস্তরময় হস্তীর উপর স্থাপিত ছিল। বীরভক্ত, বীরপুরুষ, এইরূপে বীরত্ব ও স্বদেশানুরাগের সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন।

অসাধারণ রাজভক্তি।

রাজপুতকুলগৌরব, পরাক্রান্ত সংগ্রামসিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন। যিনি সাহসে অবিচলিত ও বীরত্বে অতুল্য ছিলেন, অস্ত্রাঘাতের আশীটি গৌরবসূচক চিহ্ন, যাহার দেহ অলঙ্কৃত করিয়াছিল, যিনি

যুদ্ধে ভগ্নপদ ও ছিন্নহস্ত হইয়াও,আপনার বীরত্ব-গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। মিবারের অত্যুজ্জ্বল সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছে। তাঁহার শিশু সন্তান, শত্রুর হস্তগত। ভবিষ্যৎ বিপদে অনভিজ্ঞ, ছয় বৎসরের বালক, নিশ্চিন্তমনে আহারপানে পরিতুষ্ট হইতেছে, নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছে, এ দিকে যে, দুরন্ত শত্রু, তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা পাইতেছে, সরল ও অনভিজ্ঞ শিশু তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। দাসীপুত্র বনবীর * মিবারের সিংহাসন অধিকার করিবার আশায়, এই কোমল কোরকটিকে বৃন্তচ্যুত করিতে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে। বাপ্পারাওর পবিত্র বংশ নির্ম্মূল করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছে। একটি অসহায় রমণী এই ঘোরতর বিপদ হইতে, উদয়সিংহকে উদ্ধার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। অনাথ বালক, একটি তেজস্বিনী ধাত্রীর আশ্রয়ে থাকিয়া, আপনার জীবন রক্ষা করিতেছে। ধাত্রী পান্না,

* বনবীর সংগ্রামসিংহের ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের পুত্র। একটি দাসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। উদয়সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত, বনবীরের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু বনবীর আপনার রাজত্ব অব্যাহত রাখিবার জন্য, উদয়সিংহকে বধকরিতে কৃতসঙ্কল্প হয়।

অশ্রুতপূর্ব্ব রাজভক্তির বলে বাপ্পারাওর বংশধরকে জীবিত রাখিতে উদ্যত হইয়াছে।

কি উপায়ে পান্না এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিল, কি উপায়ে পিতৃহীন শিশু অক্ষতশরীরে রহিল, তাহা শুনিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। রাত্রিকালে উদয়-সিংহ আহার করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছে, এমন সময়ে এক জন নাপিত* আসিয়া ধাত্রীকে জানাইল, বনবীর উদয়সিংহকে হত্যা করিতে আসিতেছে। ধাত্রী তৎ-ক্ষণাৎ একটি ফলের চাঙ্গারীর মধ্যে, নিদ্রিত উদয়-সিংহকে রাখিয়া এবং উহার উপরিভাগ পত্রাদিতে ঢাকিয়া, নাপিতের হস্তে সমর্পণ করিল। বিশ্বস্ত নাপিত, সেই চাঙ্গারী লইয়া কোন নিরাপদ স্থানে গেল। এ দিকে, ধাত্রী, আপনার নিদ্রিত পুত্রকে, উদয়সিংহের শয্যায় রাখিল। এমন সময়ে, বনবীর অসিহস্তে সেই গৃহে আসিয়া, ধাত্রীকে উদয়সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ধাত্রী বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না, নীরবে, অধোমুখে স্বীয় নিদ্রিত পুত্রের দিকে অঙ্গুলি প্রসারণ করিল। বনবীর উদয়সিংহবোধে, সেই ধাত্রীপুত্রেরই প্রাণ সংহার করিয়া, চলিয়া গেল।

* রাজস্থানে এই জাতি "বারি" নামে প্রসিদ্ধ। রাজপুত-দিগের উচ্ছিষ্টমোচন করা ইহাদের কার্য্য।

অনন্তর রাজবংশীয় কামিনীগণের রোদনধ্বনির মধ্যে, সেই ধাত্রীপুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ধাত্রী নীরবে, অশ্রুপূর্ণনয়নে স্বীয় শিশু সন্তানের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া দেখিয়া, নাপিতের নিকট গমন করিল।

এইরূপে পান্না, অবলীলাক্রমে, অসঙ্কোচে আপনার হৃদয়রঞ্জন শিশু সন্তানকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিয়া, মহারাণা সংগ্রামসিংহের পুত্রের প্রাণরক্ষা করিল। যে রমণী, চিতোরের জন্য, বাপ্পারাওর বংশ-রক্ষার নিমিত্ত, জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন, স্নেহের একমাত্র পুত্তলী, সন্তানকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ করে, তাহার রাজভক্তি কত দূর উচ্চ! যে রমণী, হৃদয়রঞ্জন কুসুম-কোরককে বৃন্তচ্যুত দেখিয়াও, আপনার কর্ত্তব্য-সাধনে বিমুখ না হয়, তাহার হৃদয় কত দূর তেজস্বি-তার পরিপোষক! এই মহান্ স্বার্থত্যাগ ও মহীয়সী রাজভক্তির গৌরব বুঝিতে পারে, এরূপ লোক বিরল।

অসাধারণ সহিষ্ণুতা।

১৬৩২ সংবতের ৭ই শ্রাবণ। অদ্য মিবারের রাজ-পুতগণ "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমির জন্য, প্রাণ দিতে উদ্যত। সম্রাট্ আকবরের এক জন বিচ-

ক্ষণ সেনাপতি, রাজা মানসিংহের সহিত মিবার অধিকার করিতে আসিয়াছেন। মিবারের বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ এই আক্রমণে বাধা দিতে উদ্যত। প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীর, অদ্য প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্বের গৌরবরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প। চিরস্মরণীয় হলদিঘাটে মিবারের আশা-ভরসাস্থল বাইশ হাজার রাজপুত বীর একত্র হইয়াছে, প্রতাপসিংহ এই বাইশ হাজার রাজপুতের অধিনেতা হইয়া, পরাক্রান্ত মোগলসৈন্যের গতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

হলদিঘাট একটি গিরিবর্ত্ম। উহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ, প্রায় সকল দিকেই সমুন্নত পর্ব্বত লম্বভাবে রহিয়াছে। ঐ স্থান পর্ব্বত, অরণ্য ও ক্ষুদ্র নদীতে সমাবৃত। প্রতাপসিংহ ঐ গিরিসঙ্কট আশ্রয় করিয়া, মোগলসৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছেন। হলদিঘাটের যুদ্ধের দিন, রাজপুত বীরের অনন্ত উৎসবের দিন। রাজপুতগণ এই উৎসবে মাতিয়া, আপনাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল এবং একে একে এই উৎসবে মাতিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। এই উৎসবে মহাবীর প্রতাপসিংহ সকলের অগ্রে ছিলেন। তিনি প্রথমে আম্বেররাজ মানসিংহের দিকে ধাবিত হন। কিন্তু মানসিংহ দিল্লীর বহুসংখ্য সৈন্যের মধ্যে ছিলেন, প্রতাপ, সে সৈন্যশ্রেণী ভেদ করিতে পারিলেন

না ; মেঘ-গম্ভীর স্বরে মানসিংহকে কাপুরুষ, রাজপুত-কুলাঙ্গার বলিয়া তিরস্কার করিলেন। রাজা মান-সিংহ, প্রতাপের এ তিরস্কারে কর্ণপাত করিলেন না। এ দিকে প্রতাপ, নির্ভীকচিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগি-লেন। তিনি, তিন বার, মোগলসেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিন বার, তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। রাজপুতগণ আপনাদের প্রাণ দিয়া, তাঁহাকে তিন বার এই আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। রাণার প্রাণরক্ষার জন্য, তাহারা আত্মপ্রাণ তুচ্ছ বোধ করিয়া-ছিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ নিরস্ত হইলেন না। তাঁহার শরীরের এক স্থানে গুলির আঘাত, তিন স্থানে বড়শার আঘাত এবং তিন স্থানে অসির আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি, এই রূপে সাত স্থানে আহত হইয়াছিলেন, তথাপি উন্মত্তভাবে শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজ-পুতগণ আবার তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের অনেকে বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছিল। মিবা-রের গৌরবস্থল বীরগণের প্রায় সকলেই, অসি হস্তে করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। প্রতাপের মস্তকোপরি মিবারের রাজছত্র শোভা পাইতেছিল। সেই ছত্র লক্ষ্য করিয়া, মোগলসৈন্য চারিদিক হইতে প্রতাপকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ঐ ছত্র হইতেই প্রতাপের জীবন, তিন বার সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল,

তথাপি প্রতাপ, উক্ত রাজলক্ষণ পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু এ বার,প্রতাপকে উদ্ধার করা,অসাধ্য বোধ হইল। ঝালাকুলশ্রেষ্ঠ মান্না ইহা দেখিলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সদলে প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইয়া, সেই রাজছত্র আপনার মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। ঐ ছত্র দেখিয়া, মোগলসৈন্য, মান্নাকেই প্রতাপসিংহ মনে করিয়া, তৎপ্রতি সবেগে ধাবিত হইল। এ বার মোগলের ব্যূহভেদ হইল। প্রতাপসিংহ রক্ষা পাই-লেন। কিন্তু বীরবর মান্না আর ফিরিলেন না। তিনি প্রভুর জন্য অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া, সদলে রণভূমির ক্রোড়শায়ী হইলেন। মোগলসৈন্য রাজপুতের বিক্র-মের অসাধারণ প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু রাজপুতের জয়লাভ হইল না। মোগলসৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় চারি দিক্ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা হটিল না। চৌদ্দ হাজার রাজপুতের শোণিতে হলদি-ঘাটের ক্ষেত্র রঞ্জিত হইল। প্রতাপ, জয়লাভে নিরাশ হইয়া, রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

প্রতাপসিংহ অনুচরবিহীন হইয়া, চৈতকনামক নীলবর্ণ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক রণস্থল ত্যাগ করেন। এই অশ্বও তেজস্বিতায়, প্রতাপের ন্যায় রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। যখন দুই জন মোগল সর্দ্দার প্রতাপের পশ্চাতে ধাবিত হয়, তখন চৈতক, লম্ফ-

প্রদানে একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিৎ উত্তীর্ণ হইয়া, স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করে। কিন্তু প্রতাপের ন্যায় চৈতকও যুদ্ধস্থলে আহত হইয়াছিল। আহত স্বামীকে লইয়া, এই আহত বাহন চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ প্রতাপ, পশ্চাতে অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন; ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সহোদর ভ্রাতা শক্ত আসিতেছেন। শক্ত প্রতাপের শত্রু, তিনি ভ্রাতৃধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া মোগলের সহিত মিশিয়াছিলেন। প্রতাপ ক্ষত্রকুলের কলঙ্ক সহোদরকে দেখিয়া, ক্ষোভে ও রোষে অশ্ব স্থির করিলেন। কিন্তু শক্ত কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না। তিনি হলদিঘাটে জ্যেষ্ঠের অলৌকিক সাহস ও ক্ষমতা দেখিয়াছিলেন, স্বদেশীয়গণের অপূর্ব্ব স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে তাঁহার মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। শক্ত, প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবিত দুই জন মোগলকে নিহত করিয়া, সজলনয়নে জ্যেষ্ঠের পদানত হইলেন। প্রতাপ সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। বহু দিনের শত্রুতা অন্তর্হিত হইল। প্রতাপ প্রগাঢ় স্নেহে কনিষ্ঠকে আলিঙ্গন করিলেন। এখন, ভাই ভাই মিলিয়া, মিবারের বিলুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। অনন্তর, শক্ত, সময়ান্তরে প্রত্যাগত হইতে প্রতিশ্রুত হইয়া, ভ্রাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন।

এ দিকে পথে, চৈতকের প্রাণবিয়োগ হয়। প্রিয়তম বাহনের স্মরণার্থ, প্রতাপ ঐ স্থলে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। আজ পর্য্যন্ত ঐ স্থান "চৈতক্কা চবুতর্" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে চিরস্মরণীয় হলদিঘাট, মিবারের গৌরব-স্বরূপ রাজপুতগণের শোণিত-স্রোতে রঞ্জিত হয়। এ দিকে মোগল সেনাপতি বিজয়ী হইয়া, রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। কমলমীর* ও উদয়পুর শত্রুর হস্তে পতিত হইল। প্রতাপ, সন্তানবর্গের সহিত এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে, এক অরণ্য হইতে অন্য অরণ্যে, এক গহ্বর হইতে অন্য গহ্বরে যাইয়া, অনুসরণকারী মোগলদিগের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর আসিতে লাগিল; প্রতাপের কষ্টের অবধি রহিল না। প্রতি নূতন বৎসর, নূতন নূতন কষ্ট সঞ্চয় করিয়া, প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রতাপ অটল রহিলেন, মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলেন না। ক্রমে মিবারের আকাশ অধিকতর অন্ধকারময় হইতে লাগিল, ক্রমে পরাক্রান্ত শত্রু

* কমলমীর মিবারের একটি প্রসিদ্ধ গিরিদুর্গ। ইহার প্রকৃত নাম কুম্ভমেরু। মিবারের রাণা কুম্ভ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

অনেক স্থানে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিল, তথাপি প্রতাপ অটল রহিলেন, বাপ্পারাওর শোণিত কলঙ্কিত করিলেন না। এই সময়ে প্রতাপসিংহ এমন দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে, একদা বিশ্বাসী ভিলগণ তাঁহার পরিবারবর্গকে কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া, আহার দিয়া, তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করে।

প্রতাপের এইরূপ অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও অশ্রুতপূর্ব্ব কষ্টে সদাশয় শত্রুর হৃদয়ও আর্দ্র হইল। দিল্লীর প্রধান রাজকর্ম্মচারী ঈদৃশী সহিষ্ণুতায় মোহিত হইয়া, প্রতাপকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই ভাবে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন, "পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নহে। ভূমি ও সম্পত্তি অদৃশ্য হইবে; কিন্তু মহৎ লোকের ধর্ম্ম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। প্রতাপ, সম্পত্তি ও ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও মস্তক অবনত করেন নাই। হিন্দুস্তানের রাজগণের মধ্যে, তিনিই কেবল স্বীয় বংশের সম্মানরক্ষা করিয়াছেন।" প্রতাপ এইরূপে বিধর্ম্মী শত্রুরও প্রশংসাভাজন হইয়া, বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাণাধিক বনিতা ও সন্তানদিগের কষ্ট, এক এক সময়ে তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তিনি পাঁচ বার খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করেন, কিন্তু সুবিধার অভাবে পাঁচ বারই তাহা পরিত্যাগ করিয়া, পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়নপর

হন। একদা, তাঁহার মহিষী ও পুত্রবধূ, ঘাসের বীজ দ্বারা, কয়েকখানি রুটী প্রস্তুত করেন। ঐ খাদ্যের একাংশ, সকলে সেই সময় ভোজন করিয়া, অপরাংশ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেন। কিন্তু, হঠাৎ একটি বন্য বিড়াল, সেই অবশিষ্ট রুটী লইয়া পলায়ন করে। অবশিষ্ট খাদ্য অপহৃত হইল দেখিয়া, প্রতাপের একটি দুহিতা, কাতরভাবে কাঁদিয়া উঠে; প্রতাপ অদূরে অর্দ্ধশয়ান থাকিয়া, আপনার শোচনীয় অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিলেন, দুহিতার রোদনে চমকিত হইয়া দেখেন, রুটীখানি অপহৃত হইয়াছে। বালিকা কাতর হইয়া, কাঁদিতেছে। প্রতাপ অম্লানবদনে, হলদিঘাটে, স্বদেশীয়গণের শোণিতস্রোত দেখিয়াছিলেন, অম্লান-বদনে, স্বদেশীয়দিগকে, স্বদেশের সম্মানরক্ষার্থ, আত্ম-প্রাণ, উৎসর্গ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, অম্লান-বদনে রাজপুতবংশের গৌরবরক্ষার জন্য, রণস্থলের ভয়ঙ্কর দৃশ্যে দৃক্‌পাত না করিয়া, কহিয়াছিলেন, "এই ভাবে দেহ বিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" কিন্তু এক্ষণে তিনি, স্থিরচিত্তে তনয়ার কাতরতা দেখিতে সমর্থ হইলেন না। স্নেহাস্পদ বালিকাকে কাতরস্বরে কাঁদিতে দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল, যেন শত শত কালভুজঙ্গ আসিয়া, সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিল, প্রতাপ আর যাতনা সহিতে

পারিলেন না, আপনার কষ্ট দূর করিবার জন্য, আক-বরের নিকট আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় জানাইলেন।

প্রতাপের এই অধীনতাস্বীকারের সংবাদে, আক-বর, নগরমধ্যে মহোল্লাসে, উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ দিলেন। প্রতাপ, আকবরের নিকট যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, সেই পত্র, পৃথ্বীরাজ দেখিতে পাই-লেন। পৃথীরাজ, বিকানেরের অধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। স্বজাতিপ্রিয়তা ও স্বজাতিহিতৈষিতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তিনি প্রতাপকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। প্রতাপ, হঠাৎ দিল্লীশ্বরের নিকট অবনত-মস্তক হইবেন, ইহা ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল। পৃথীরাজ আর কালবিলম্ব না করিয়া, প্রতাপকে উৎসাহিত করিবার জন্য, কয়েকটি কবিতা রচনা পূর্ব্বক, প্রতাপের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

পৃথ্বীরাজের এই উৎসাহবাক্য শতসহস্র রাজ-পুতের তুল্য বলকারক হইল। ইহা প্রতাপের দেহে জীবনী শক্তি দিল, এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বদেশের গৌরবকর মহৎ কার্য্য সাধনে উত্তেজিত করিল। প্রতাপ, দিল্লীশ্বরের নিকট অবনতিস্বীকারের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু, এই সময়ে বর্ষার এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, প্রতাপ, কিছুতেই পর্ব্বতকন্দরে থাকিতে পারিলেন না; মিবার পরিত্যাগ

পূর্ব্বক মরুভূমি অতিবাহন করিয়া, সিন্ধু নদের তটে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সঙ্কল্পসিদ্ধির মানসে, তিনি পরিবারবর্গ ও মিবারের কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুতের সহিত, আরাবলী হইতে নামিয়া, মরুপ্রান্তে উপনীত হন। এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত সমস্ত ধন আনিয়া, প্রতাপের নিকট উপস্থিত করেন। ঐ সম্পত্তি এত ছিল যে, উহা দ্বারা, বার বৎসর, পঁচিশ হাজার ব্যক্তির ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। কৃতজ্ঞতার এই মহৎ দৃষ্টান্তে, প্রতাপ পুনর্ব্বার সাহসসহকারে অভীষ্ট মন্ত্র-সাধনে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে অনুচরবর্গ একত্র হইল। প্রতাপ ইহাদিগকে লইয়া, আরাবলী অতি-ক্রম করিলেন। মোগল সেনাপতি শাহবাজ খাঁ, সসৈন্যে দেবীর নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, প্রতাপ প্রবলবেগে আসিয়া, মোগলসৈন্য আক্রমণ করিলেন। দেবীরের যুদ্ধে প্রতাপের জয়লাভ হইল। শাহবাজ খাঁ হত হইলেন। ক্রমে কমলমীর ও উদয়পুর হস্তগত হইল। ক্রমে চিতোর, আজমীঢ় ও মণ্ডলগড় ব্যতীত, সমস্ত মিবারপ্রদেশ প্রতাপের পদানত হইয়া উঠিল। আকবর এই বিজয়বার্ত্তা শুনিলেন। পরাক্রান্ত মোগল, দশ বৎসর, বহু অর্থ ব্যয় ও বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া, মিবারে যে বিজয়লক্ষ্মী অধিকার করিয়াছিলেন, প্রতাপ

সিংহ, এক দেবীরের যুদ্ধে, তাহা আপনার করায়ত্ত করিলেন। ইহার পর, মোগলসৈন্য মিবারে আর উপস্থিত হইল না। প্রতাপের বিজয়লক্ষ্মী অটল থাকিল। কিন্তু এইরূপ বিজয়ী হইলেও, প্রতাপ জীবনের শেষ অবস্থায়, শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পর্ব্বতশিখরে উঠিলেই, তাঁহার দৃষ্টি, চিতোরের দুর্গপ্রাচীরের দিকে নিপতিত হইত, অমনি তিনি যাতনায় অধীর হইয়া পড়িতেন। যে চিতোরে বাপ্পারাওর জীবিত কাল অতিবাহিত হইয়াছিল, যে চিতোরে রাজপুতকুলগৌরব সমর সিংহ, দৃষদ্বতী নদীর তীরে, পৃথ্বীরাজের সহিত দেহত্যাগ করিতে, সমরসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিলেন, যে চিতোরে বাদল, জয়মল্ল ও পুত্ত, পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অম্লানবদনে—অক্ষুব্ধহৃদয়ে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজ সেই চিতোর শ্মশান, আজ সেই চিতোরের প্রাচীর অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ভীষণ শৈলশ্রেণীর ন্যায় রহিয়াছে। প্রতাপ, প্রায়ই এইরূপ চিন্তায় অবসন্ন হইতেন, প্রায়ই চিন্তার তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে, তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইত।

এইরূপ অন্তর্দ্দাহে, প্রতাপ তরুণবয়সেই ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। দুরন্ত রোগ আসিয়া, শীঘ্র তাঁহার দেহ অধিকার করিল। প্রতাপ ও

তাঁহার সর্দ্দারগণ, দুর্গতির সময়ে, আপনাদিগকে ঝড়-বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য, পেশোলা হ্রদের তীরে, যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কুটীরেই প্রতাপের জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত হয়। প্রতাপ, স্বীয় তনয় অমরসিংহের প্রতি আস্থাশূন্য ছিলেন। তিনি জানিতেন, কুমার অমরসিংহ নিরতিশয় সৌখীন যুবক, রাজ্যরক্ষার ক্লেশ কখনই তাঁহার সহ্য হইবে না। পুত্রের বিলাসপ্রিয়তায়, প্রতাপ হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন, অন্তিম সময়েও এই যাতনা তাঁহা হইতে অন্তর্হিত হইল না। এই দুঃসহ মনোবেদনায়, আসন্নমৃত্যু প্রতাপের মুখ হইতে বিকৃত স্বর বাহির হইতে লাগিল। এক জন সর্দ্দার, ইহা দেখিয়া,প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার এমন কি কষ্ট হইয়াছে যে, প্রাণবায়ু শান্তভাবে বাহির হইতে পারিতেছে না। প্রতাপ উত্তর করিলেন, "যাহাতে স্বদেশ তুরুকের হস্তগত না হয়, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি জানিবার জন্য আমার প্রাণ এখনও অতি কষ্টে বিলম্ব করিতেছে।" পরিশেষে তিনি কুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "হয় ত, এই কুটীরের পরিবর্ত্তে, বহুমূল্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, আমরা মিবারের যে স্বাধীনতরাক্ষার জন্য, এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হয় ত তাহা এই কুটীরের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে।" সর্দ্দারগণ প্রতাপের এই

বাক্যে শপথ করিয়া কহিলেন, "যে পর্য্যন্ত মিবার স্বাধীন না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোনও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে না।" প্রতাপ আশস্ত হইলেন; নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল। মিবার আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে শুনিয়া, তিনি শান্ত-ভাবে, ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।

এইরূপে ১৫৯৭ খ্রীঃ অব্দে স্বদেশবৎসল প্রতাপ সিংহের পরলোকপ্রাপ্তি হইল। যদি মিবারের থিউ-কিদিদিস্ অথবা জেনোফন থাকিতেন, তাহা হইলে "পেলপনিসসের সমর" * অথবা "দশ সহস্রের প্রত্যা-বর্ত্তন†" কখনও এই রাজপুতশ্রেষ্ঠের অবদান অপেক্ষা,

* গ্রীসের দুইটি নগর—স্পার্টা ও এথিনা। পারস্যের সহিত যুদ্ধে, এথিনা বিশেষ গৌরবান্বিত হইলে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্পার্টা, অসূয়াপরবশ হইয়া,সমরসজ্জার আয়োজন করে। ইহাতে স্পার্টার সহিত এথিনার তিনটি সংগ্রাম হয়। ইহাই "পেলপনিসসের যুদ্ধ" বলিয়া বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক থিউকিদিদিস্ এই মহাসমরের সবিস্তর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

† পারস্যের রাজা দ্বিতীয় দরায়ুস লোকান্তরগত হইলে, তাঁহার পুত্র অর্ত্তক্ষত্র পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু, অর্ত্তক্ষত্রের ভ্রাতা কাইরস্ রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য, দশ সহস্র গ্রীক সৈন্যের সাহায্যে সমরে প্রবৃত্ত হন। খ্রীঃ পূঃ ৪০১ অব্দে কাইরস্ সমরে নিহত হইলে, গ্রীক সেনাপতি জেনোফন তাঁহার দশ সহস্র সৈন্যের সহিত বিশিষ্ট পরাক্রম ও কৌশলসহকারে স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ইহাই "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন"

ইতিহাসে অধিকতর মধুরভাবে কীর্ত্তিত হইত না। অনমনীয় বীরত্ব, অবিচলিত দৃঢ়তা, অশ্রুতপূর্ব্ব সহিষ্ণুতাসহকারে, প্রতাপ, দীর্ঘকাল প্রবলপরাক্রান্ত, উন্নতাকাঙ্ক্ষ, সহায়সম্পন্ন সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। এ জন্য আজ পর্য্যন্ত প্রতাপসিংহ প্রত্যেক রাজপুতের হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজ করিতেছেন। যত দিন স্বদেশহিতৈষিতা রাজপুতের মনে প্রদীপ্ত থাকিবে, তত দিন প্রতাপ সিংহের এই দেবভাবের ব্যত্যয় হইবে না।

রাজার জন্য আত্মত্যাগ।

রাজার জন্য মিবারের কুলপুরোহিতের আত্মত্যাগের কথা অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্বে পূর্ণ। যদি জগতে, কোনরূপ নিঃস্বার্থপরতা থাকে, তাহা হইলে, এই পুরোহিত, তাহার জীবন্ত মূর্ত্তি, যদি কোনরূপ উদার, মহানুভাবের আশ্রয়স্থান থাকে, তাহা হইলে, তাহা, এই পুরোহিতের হৃদয়। নিজের জীবন দিয়া, রাজার জীবন রক্ষা করা নিঃসন্দেহ অলৌকিক কার্য্য। মিবা-

বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। গ্রীক সেনাপতি ও ইতিহাসলেখক জেনোফন ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিয়াছেন।

রের পুরোহিত এই অলৌকিক কার্য্য করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এ নশ্বর জগতে, কাহারও সহিত এই দানবীরের তুলনা সম্ভবে না।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে একদা দুইটি ক্ষত্রিয়-যুবক মৃগয়ার আমোদে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। যুবক-দ্বয়ের মধ্যে আকৃতিগত কোনরূপ বৈষম্য নাই। উভ-য়ের দেহই বীরত্বব্যঞ্জক। উভয়েই সুগঠিত, সুশ্রী ও যৌবনসুলভ তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ। এই তেজস্বিতার প্রখর দীপ্তির সহিত মাধুর্য্যের স্নিগ্ধ আলোক, উভ-য়ের মুখমণ্ডলেই বিকাশ পাইতেছিল। যুবকদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল সদ্ভাব ছিল। দীর্ঘকাল, উভয়েই প্রীতির আদানপ্রদানে সুখানুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু মিবা-রের মৃগয়াভূমিতে, হঠাৎ এই সদ্ভাবের ব্যতিক্রম হইল, হঠাৎ প্রীতির স্থলে বিদ্বেষ স্থান পরিগ্রহ করিল। যুবক-দ্বয় কোন কারণে, সহসা উভয়ে, উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। এই দুইটি তেজস্বী ক্ষত্রিয় বীর, মহা-রাণা উদয় সিংহের পুত্র। একটির নাম প্রতাপ সিংহ, অপরটির নাম শক্ত সিংহ। একটি অতুল্য বীরত্ব ও অলৌকিক সহিষ্ণুতা দেখাইয়া, প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, অপরটি স্বদেশী, স্বজাতির শোণিতে আপনার বিদ্বেষবুদ্ধির পরিতর্পণ করিয়াছেন। একটি জাতীয় গৌরবের জীবন্ত মূর্ত্তি, অপরটি জাতীয় কল-

ক্কের আশ্রয়ভূমি। এখন এই তেজস্বী ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে বিরোধ ঘটিল। এখন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইবার সূত্রপাত হইল।

প্রতাপ সিংহ, মহারাণা উদয় সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং মিবারের সিংহাসন, তাঁহারই হস্তগত হইয়াছিল। উদয় সিংহের দ্বিতীয় পুত্র শক্ত সিংহ, ভ্রাতার আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতেছিলেন। তেজস্বিতা ও কঠোরতায়, শক্ত, কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। একদা, একখানি তরবারি প্রস্তুত হইয়া আসিলে, উহাতে ধার আছে কি না, জানিবার জন্য, কতকগুলি মোটা সূতা একত্র ধরিয়া, তরবারির আঘাতে, উহা দ্বিখণ্ড করিবার প্রস্তাব হয়। শক্ত নিকটে ছিলেন, তিনি গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, "যে তরবারি, অতঃপর মাংস, অস্থি ছেদন করিবে, সূতা কাটিয়া, তাহার পরীক্ষা করা উচিত নহে।" শক্ত, ইহা কহিয়াই, পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীরভাবে তরবারি লইয়া, নিজের অঙ্গুলিতে আঘাত করিলেন। আহত স্থান হইতে অনর্গল শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। এই সময় শক্তের বয়স পাঁচ বৎসর। পঞ্চবর্ষীয় শিশু যে সাহস ও তেজস্বিতা দেখাইয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত সে সাহস ও তেজস্বিতা, ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর যে বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহা শক্তের হৃদয় হইতে দূর

হয় নাই। প্রতাপ সিংহও, কনিষ্ঠের উপর জাতক্রোধ ছিলেন। কিছুতেই আর পূর্ব্বতন সদ্ভাব ও প্রীতি আসিয়া, উভয়কে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিল না। ক্রমে এই বিদ্বেষ ও ক্রোধ গাঢ়তর হইল, ক্রমে উভয়ে, উভয়ের শোণিতপাতে সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। একদা প্রতাপ সিংহ, চক্রাকার অস্ত্রক্রীড়া-ভূমিতে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। তাঁহার হস্তে শাণিত বড়শা দীপ্তি পাইতেছিল। তিনি, এই ক্রীড়া-ভূমিতে আপনার অস্ত্রচালনার কৌশলের পরিচয় দিতেছিলেন। এমন সময়ে, শক্ত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। প্রতাপ গম্ভীরস্বরে কনিষ্ঠকে কহিলেন, "আজ এই ক্রীড়াভূমিতে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমাদের বিবাদের মীমাংসা হইবে, আজ দেখিব, শাণিত বড়শাচালনায় কাহার অধিকতর ক্ষমতা আছে।" শক্ত হঠিলেন না, দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজন হইলে, তিনি জ্যেষ্ঠকে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তুমি কি আরম্ভ করিবে?" অবিলম্বে উভয়ে বড়শা লইয়া, উভয়ের সম্মুখীন হইলেন। মিবারের আশাভরসাস্থল তেজস্বী বীরযুগলের জীবন, অদ্য সংশয়দোলায় আরোহণ করিল। ঠিক এই সময়ে, উভয় ভ্রাতার মধ্যে, একটি কমনীয় মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। সমাগত পুরুষ, তেজস্বিতা ও মধুরতা, উভয়েরই আশ্রয়স্থল, উভয়ই তাঁহার দেহলক্ষ্মীকে গৌরবান্বিত

করিয়াছিল। সাহসী পুরুষ, ধীরভাবে যুদ্ধোদ্যত দুই ভ্রাতার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। এই মাধুর্য্যময় তেজস্বী পুরুষ মিবারের পবিত্র কুলের মঙ্গলবিধাত্রী দেবতা। পবিত্র কুলপুরোহিত, অদ্য দুই ভ্রাতার যুদ্ধ-নিবারণে উদ্যত, অদ্য দুই ভ্রাতার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দুইয়ের জীবনরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প। পুরোহিত ধীর গম্ভীরস্বরে দুই ভ্রাতাকে কহিলেন, "এ ক্রীড়াভূমি, প্রকৃত যুদ্ধস্থল নহে। ভাই ভাই যুদ্ধ করা, প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্বের লক্ষণ নহে। যুদ্ধে ক্ষান্ত হও। বংশের মর্য্যাদা নষ্ট করিও না। মহাপুরুষ বাপ্পারাওর পবিত্র কুল কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইও না। দেখিও, ভ্রাতার শোণিতে যেন, ভ্রাতার অস্ত্রের পবিত্রতা নষ্ট না হয়।" কিন্তু পুরোহিতের এ কথায় কোন ফল হইল না। বীরযুগল, উভয়ে, উভয়ের জীবনসংহারে সমুত্থিত হইলেন। শাণিত বড়শা, পূর্ব্বের ন্যায় উভয়ের হস্তে দীপ্তি পাইতে লাগিল। পবিত্রকুলের হিতার্থী পবিত্র-স্বভাব পুরোহিত, ইহা দেখিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত ও লোচনদ্বয় দীপ্তিময় হইল, মুহূর্ত্তমাত্র তিনি, কি যেন চিন্তা করিলেন। আর কোন কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না। নিমেষ মধ্যে, তিনি ক্ষুদ্র তরবারি বাহির করিয়া, আপনার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইল।

মিবারের মঙ্গলবিধাত্রী কুলদেবতা, মহতী দেবতাস্বরূপ রাজার প্রাণরক্ষার জন্য, অকাতরে, অম্লানভাবে আত্ম-জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

প্রতাপ ও শক্ত, ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাদের অঙ্গ অবশ ও হস্ত শিথিল হইয়া পড়িল। পুরোহিতের শব তাঁহাদের মধ্যস্থলে পড়িয়া রহিয়াছিল। তাঁহার শোণিত, তাঁহাদের দেহ স্পর্শ করিয়াছিল। প্রতাপ সিংহ মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। আর তিনি কনিষ্ঠকে অস্ত্রাঘাত করিলেন না। আত্মত্যাগের উদ্দেশ্য সাধিত হইল। প্রতাপ হস্তোত্তোলন করিয়া, তীব্রস্বরে কনিষ্ঠকে আপনার রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে কহিলেন। শক্ত, জ্যেষ্ঠের আদেশের নিকট, মস্তক অবনত করিলেন, এবং মিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোগল সম্রাট আকবরের সহিত সম্মিলিত হইয়া, প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই বিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে আবার প্রণয় স্থাপিত হইয়াছিল। সেই মিবারের যুদ্ধস্থলে, হলদীঘাটের গিরিসঙ্কটে, শক্ত, জ্যেষ্ঠের অসামান্য সাহস, লোকাতীত পরাক্রম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন; যুদ্ধের অবসানে কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠের পদানত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন; দুই জন, আবার প্রীতিভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

অসাধারণ পতিভক্তি।

রাজস্থানে যশলমীর নামে একটি জনপদ আছে। ঐ জনপদ, মরুভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত। উহার চারি দিকে, বিশাল বালুকাসাগর, নিরন্তর ভীষণভাবে পরিপূর্ণ থাকিয়া, পথিকের হৃদয়ে ভীতির উৎপাদন করিতেছে। প্রকৃতির ঐ ভীষণ রাজ্যে, কেবল যশলমীর, শ্যামল তরুলতায় পরিশোভিত রহিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যশলমীরের অন্তর্গত পূগল নামক ভূখণ্ডে, অনঙ্গদেব আধিপত্য করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম সাধু। ভট্টিজাতির মধ্যে, সাধু সর্ব্বপ্রধান বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সাহস, তাঁহার ক্ষমতা ও তাঁহার বীরত্বের নিকট, সকলেই মস্তক অবনত করিত। তিনি, বিশাল মরুভূমি হইতে সিন্ধু নদের তট পর্য্যন্ত, আপনার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে, কেহই পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডের আত্মপ্রাধান্য ঘোষণা করিতে পারিত না। পূগলকুমার, এইরূপে ভীষণ মরুভূমির মধ্যে, অসীম প্রতাপ ও অবিচলিত সাহসের সহিত স্বীয় আধিপত্য বদ্ধমূল রাখিয়াছিলেন।

একদা সাধু, জনপদ-বিজয়-প্রসঙ্গে, কোন যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে বহু-

সংখ্য অশ্ব, উষ্ট্র ও সৈন্যের সহিত অরিন্ত নগরে উপ-নীত হইলেন। অরিন্ত নগর, মহিলবংশীয় মাণিক-রাওর রাজধানী। মাণিকরাও, অনেকগুলি গ্রামে আধিপত্য করিতেন। তিনি, আদরের সহিত পূগল-কুমারকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সাধুও প্রসন্নচিত্তে মহিলরাজের অতিথি হইলেন। এই সময়ে, মহিলরাজ মাণিকরাওর দুহিতা কর্ম্মদেবী, সাধুর গুণ-পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিলেন। রাঠোরবংশীয় মন্দোর-রাজকুমার অরণ্যকমলের সহিত মহিল-রাজকুমারী কর্ম্মদেবীর বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু এ প্রস্তাবে আবদ্ধ হইতে, কর্ম্মদেবীর ইচ্ছা হইল না। পূগল-রাজকুমারের অতুল বীরত্ব ও সাহসের কাহিনী, তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল; এখন তিনি সেই বীরবরের বীরত্ব-ব্যঞ্জক অনির্ব্বচনীয় দৃঢ়তার পরিচয় পাইলেন। বীরবালা, এ বীরকীর্ত্তির অসম্মান করিলেন না, অরণ্যকমলকে অতি-ক্রম করিয়া, মরুভূবিহারী পুরুষসিংহের সহিত পরি-ণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে উৎসুক হইলেন।

সাধু, এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। অরণ্যকমলের ভয়ে, তাঁহার হৃদয়, কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তিনি, আপনার সাহস ও বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া, ঐ লাবণ্যবতী কামিনীকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। যথাসময়ে বিবাহের দিন অবধারিত

হইল। যথাসময়ে মাণিকরাও, স্বীয় রাজধানী অরিস্ত নগরে দুহিতা-রত্নকে সাধুর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এ বিবাহে, অরণ্যকমলের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তাঁহার হৃদয় হইতে, আশার সম্মোহন দৃশ্য অন্ত-র্হিত হইল। যে কল্পনা, তাঁহার সম্মুখে, ধীরে ধীরে সুখের, শান্তির ও প্রীতির রাজ্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা অতর্কিতভাবে কোথায় যেন মিশিয়া গেল। অরণ্যকমল প্রতিহিংসার কঠোর দংশনে অধীর হই-লেন। আশার সম্মোহন দৃশ্যের স্থলে, মোহিনী কল্প-নার অনন্ত উৎসবময় রাজ্যের পরিবর্ত্তে, অরণ্যকমল, হিংসার তীব্র হলাহলপূর্ণ বিকট ভাব দেখিতে লাগি-লেন। তিনি বৈরনির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিছুতেই এ সাধনা হইতে অণুমাত্রও বিচ-লিত হইবেন না। যত দিন ক্ষত্রিয়শোণিতের শেষ বিন্দু, ধমনীতে বর্ত্তমান থাকিবে, প্রতিজ্ঞা করিলেন, তত দিন প্রতিদ্বন্দ্বী সাধুকে নির্জ্জিত করিতে বিমুখ থাকিবেন না। কর্ম্মদেবীলাভে বঞ্চিত হওয়াতে, অরণ্যকমলের হতাশ হৃদয় এইরূপ অধীর হইয়াছিল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, দৃঢ় সঙ্কল্প তাঁহাকে এইরূপ ভয়ঙ্কর কার্য্য-সাধনে উত্তেজিত করিয়াছিল। সাধুর ভবিষ্য সুখের পথ, এইরূপে কণ্টকিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল।

অরিস্ত-রাজ, জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ বহুমূল্য

মণি, মুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র, একটি স্বর্ণময় বৃষ এবং তেরটি কুমারী দিয়া স্নেহসহকারে বিদায় দিলেন। তিনি, জামাতার সহিত চারি হাজার মহিলসৈন্য দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সাধু, উহাতে অমত প্রকাশ করিয়া, সাত শত মাত্র ভট্টি সেনা এবং আপনার অসাধারণ সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই, নবপরিণীতা প্রণয়িনীকে নিজ রাজ্যে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। শেষে অরিন্তরাজের অনুরোধে, তাঁহাকে পঞ্চাশ জন মাত্র মহিলসৈন্য সঙ্গে লইতে হইল। কর্ম্মদেবীর ভ্রাতা মেঘরাজ এই সৈন্যের অধিনেতার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

সকলে অরিন্ত নগর হইতে যাত্রা করিল। সকলে উৎসব ও আহ্লাদের স্রোতে ভাসিয়া, পূগলনগরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে চন্দননামক স্থানে, সাধু যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন দূর হইতে মরুভূমির ধূলিরাশি উড়াইয়া, এক দল সৈন্য, প্রবলবেগে তাঁহার অভিমুখে আসিতে লাগিল। সৈন্যদল দেখিতে দেখিতে, ভীষণ মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিল, দেখিতে দেখিতে মহাদর্পে সাধুর বিশ্রাম-ভূমির সম্মুখবর্ত্তী হইল। সাহসী সাধু, চাহিয়া দেখি-লেন, বহুসংখ্য সৈন্য তাঁহার নিকটে আসিতেছে। অরণ্যকমল, তরবারি আস্ফালন করিতে করিতে, এই

সৈন্যদল পরিচালনা করিতেছেন। দেখিবামাত্র, সাধু, ধীরভাবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ধীরভাবে, আপনার সৈন্যদিগকে আত্মবিসর্জ্জন অথবা বিজয়লক্ষ্মীর অধিকারের জন্য, প্রস্তুত হইতে কহিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে চারি হাজার রাঠোরসৈন্য উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী তেজস্বী অরণ্যকমল, তদীয় শোণিতপাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, ইহাতে সাধু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, ধীরতার সীমা অতিক্রম করিয়া কিছুমাত্র আত্মচাপল্যের পরিচয় দিলেন না। বীরত্বাভিমানী, বীরযুবক, বীরধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন। দেখিতে দেখিতে চারি হাজার রাঠোরসৈন্য, ভটিসেনার মধ্যে আসিয়া পড়িল। সাহসী রাঠোরগণ সংখ্যায় অধিক ছিল,তাহারা, অল্পসংখ্যক ভটিসেনাকে একবারে আক্রমণ করিল না। এরূপ আক্রমণে, তাহারা সর্ব্বদা ঘৃণা প্রদর্শন করিত। প্রথমে, প্রতিদ্বন্দ্বীতে প্রতিদ্বন্দ্বীতে, দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বীকে মুহুর্মুহুঃ আক্রমণ করিয়া, আপনার সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিল। ১৪০৭ খ্রীঃ অব্দে, রাজস্থানের মরুপ্রান্তরবর্ত্তী চন্দননামক ভূখণ্ডে লাবণ্যবতী রাজপুত-বালার জন্য, এইরূপে দলে দলে যুদ্ধ হইল। অবশেষে সাধু, অশ্বারূঢ় হইয়া সমরভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তিনি, দুই বার অস্ত্রচালনা করিতে

করিতে, পরাক্রান্ত রাঠোরসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দুই বার তাঁহার অস্ত্রাঘাতে বহুসংখ্য রাঠোর, বীরশয্যায় শয়ন করিল। অসময়ে, অতর্কিতভাবে, এই রূপ যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে, কর্ম্মদেবী ভীত হইলেন না, তাঁহার সুখদুঃখের অদ্বিতীয় অবলম্বন, প্রাণাধিক স্বামী, বহুসংখ্য শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহাতে কর্ম্মদেবী কাতর হইলেন না। তিনি, সাহসের সহিত প্রিয়তমকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমের অদ্ভুত সমরচাতুরী ও অদ্ভুত সাহস দেখিয়া, মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সাধুর পরাক্রমে ছয় শত রাঠোর সমরশায়ী হইল, সাধুরও প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কর্ম্মদেবী, পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে রহিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে স্বামীকে কহিলেন, "আমি তোমার রণপারদর্শিতা দেখিব, তুমি, যদি রণশায়ী হও, আমিও তোমার অনুগামিনী হইব।" সাধু বালিকার অপরিস্ফুট কুসুম-সুকুমার দেহে, এইরূপ অসাধারণ তেজস্বিতা ও অটলতার আবির্ভাব দেখিয়া, প্রীত হইলেন। তিনি, অরণ্যকমলকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। অরণ্যকমল, এই যুদ্ধ, শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলিতে একান্ত উৎসুক ছিলেন, এখন প্রতিদ্বন্দ্বীর শোণিতে আপনার অসম্মানের চিহ্ন প্রক্ষালন করিতে, সাধুর

সম্মুখীন হইলেন। মুহূর্ত্তকাল উভয়ে, উভয়কে শীলতার সহিত সম্ভাষণ করিলেন। এ পবিত্র যুদ্ধে, প্রতারণার আবেশ নাই, চাতুরীর আবির্ভাব নাই, অধর্ম্মের চিহ্ন নাই; তেজস্বী, ক্ষত্রিয়যুবকদ্বয়, আত্মপ্রাধান্য, আত্মমর্য্যাদা-রক্ষার জন্য, মুহূর্ত্তকাল উভয়ে, উভয়কে শীলতার সহিত সম্ভাষণ করিয়া, অসি উত্তোলন করিলেন। অস্ত্রের সংঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠিল। সাধু, অরণ্যকমলের স্কন্ধে তরবারির আঘাত করিলেন, অরণ্যকমলও, সাধুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া, বিদ্যুদ্বেগে স্বীয় অসিচালনা করিলেন। যুবকদ্বয় অচৈতন্য হইয়া, যুদ্ধস্থলে পড়িয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, অরণ্যকমলের চেতনালাভ হইল। কিন্তু সাধু, আর এ নিদ্রা হইতে উঠিলেন না। তেজস্বী পূগলকুমার তেজস্বিতার সম্মানরক্ষার জন্য, অকাতরে, অম্লানভাবে, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কর্ম্ম-দেবীর সমস্ত আশাভরসা ফুরাইল। যে কল্পনার তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে, তেজস্বিনী বালা, পিতামাতার নিকট বিদায় লইয়া, হৃষ্টচিত্তে পূগলে আসিতেছিল, তাহা চিরদিনের জন্য অন্তর্ধান করিল। বালিকার প্রাণের অধিক ধন ভীষণ মরুপ্রান্তরে অপহৃত হইল। কিন্তু, কর্ম্মদেবী ইহাতে কাতর হইলেন না। তিনি ধীর-ভাবে অসিগ্রহণ করিলেন, এবং ধীরভাবে উহা দ্বারা, নিজ হস্তে, নিজের এক বাহু কাটিয়া কহিলেন,

"এই বাহু প্রিয়তমের পিতাকে দিয়া, যেন বলা হয় যে, তাঁহার পুত্রবধূ এইরূপই ছিল।" তিনি আর এক বাহুও, এই ভাবে কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। কর্ম্মদেবী, ঐ ছিন্ন বাহু, তাঁহার বিবাহের মণিমুক্তার সহিত মহিলকবিকে উপহার দিতে কহিলেন। অনন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে চিতা প্রস্তুত হইল। পতিপ্রাণা, সাধ্বী বালা, প্রাণাধিক ধনের পার্শ্বে প্রশান্তভাবে জ্বলন্ত চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

কর্ম্মদেবীর ছিন্ন বাহু, যথাসময়ে পূগলে পঁহুছিল। বৃদ্ধ পূগলরাজ উহা দগ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন। দাহ-স্থলে একটি পুষ্করিণী খনিত হইল। ঐ পুষ্করিণী "কর্ম্ম-দেবীর সরোবর" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল। অরণ্য-কমলের ক্ষতস্থান ভাল হইল না। ছয় মাসের মধ্যে, তিনিও সাধুর অনুগমন করিলেন।

অপূর্ব্ব দানশীলতা।

যাঁহারা, ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত পরিচিত আছেন, ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন কাহিনী যাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে, তাঁহারা, প্রাচীন হিন্দু আর্য্যদিগের কীর্ত্তিকলাপে অবশ্য আহ্লাদ প্রকাশ করিবেন এবং

অবশ্য সেই মহিমান্বিত মহাপুরুষগণকে বিনম্রভাবে পবিত্র প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হইবেন। আর্য্যগণের কীর্ত্তি, কেবল যুদ্ধকার্য্যেই শেষ হয় নাই। বীরত্ববৈভবের সহিত জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, সত্যনিষ্ঠায় ও দানশীলতাপ্রভৃতি গুণে তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর নিকট পূজা পাইয়া আসিতেছেন। প্রতাপ সিংহ প্রভৃতির ন্যায়, ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে, বুদ্ধ প্রভৃতির ধর্ম্মনিষ্ঠার মোহিনী শক্তি বিকাশ পাইয়াছে, এবং শিলাদিত্য প্রভৃতির দানশীলতার অপূর্ব্ব মহিমা পরিস্ফুট হইয়াছে। ভার-তের ঐ অপূর্ব্ব দানশীলতার কয়েকটি কথা, এ স্থলে বিবৃত হইতেছে।

খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে, যখন মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য, কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, অনেক রাজ্য আপনার বিজয়-পতা-কায় শোভিত করিতেছিলেন, যখন মহাবীর পুলকেশ আপনার অসাধারণ ভুজবলের মহিমায় মহারাষ্ট্র-রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, চীন দেশের চিরপ্রসিদ্ধ, দরিদ্র পরিব্রাজক হিউএন্ থসঙ্গ, যখন নালন্দানামক স্থানের পবিত্র বৌদ্ধ মহাবিদ্যালয়ে জ্ঞানবৃদ্ধ শীলভদ্রের পদতলে বসিয়া, হিন্দু আর্য্যগণের নানাশাস্ত্রের রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন, তখন

মহারাজ শিলাদিত্য গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে, হিন্দু-দিগের পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে, একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। প্রয়াগের পাঁচ ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমি, ঐ মহোৎসবের ক্ষেত্র ছিল। দীর্ঘকাল হইতে ঐ ভূমি, "সন্তোষ-ক্ষেত্র" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব, প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি প্রধান ঘটনা। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গফিটপরিমিত ভূমি, গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানের বৃহৎ বৃহৎ গৃহে, স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাস ও রেসমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্য স্তূপা-কারে সজ্জিত থাকিত। এই বেষ্টিত স্থানের নিকট ভোজনগৃহ সকল বাজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণী-বদ্ধভাবে শোভা পাইত। এক একটি ভোজন-গৃহে, একবারে প্রায় হাজার লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্ব্বে ঘোষণাদ্বারা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, দুঃখী, পিতৃমাতৃহীন, আত্মীয়-বন্ধু-শূন্য, নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে, পবিত্র প্রয়াগে আসিয়া, দানগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইত। মহারাজ শিলাদিত্য, আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজগণের সহিত ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভীরাজ্যের অধিপতি ধ্রুবপতি ও আসাম-রাজ

ভাস্করবর্ম্মা, ঐ করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। ঐ দুই করদ ভূপতির ও মহারাজ শিলাদিত্যের সৈন্য, সন্তোষ-ক্ষেত্রের চারি দিক বেষ্টন করিয়া থাকিত। ধ্রুবপতির সৈন্যের পশ্চিমে, বহুসংখ্য অভ্যাগত লোক, আপনাদের শিবিরস্থাপন করিত, এইরূপ শৃঙ্খলা বিশেষ পারিপাট্যশালী ও সুবুদ্ধির পরিচায়ক ছিল। বিতরণ-সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে, সন্তোষ-ক্ষেত্রের রাশীকৃত ধন, দুষ্ট লোকে আত্মসাৎ করিতে পারে, এই আশঙ্কায়, উহার চারি দিক সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করা হইত। ঐ ক্ষেত্র, গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলের ঠিক পশ্চিমে ছিল। শিলাদিত্য, আপনার সৈন্যগণের সহিত গঙ্গার উত্তর তীরে থাকিতেন। ধ্রুবপতি ক্ষেত্রের পশ্চিমে এবং ক্ষেত্র ও অভ্যাগত দলের মধ্যভাগে, সৈন্য স্থাপন করিতেন, আর ভাস্করবর্ম্মা, যমুনার দক্ষিণ তটে আপনার সৈনিকদল রাখিতেন।

অসীম আড়ম্বরের সহিত উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইত। শিলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিপোষক হইলেও, হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা করিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ, উভয়কেই আদরসহকারে আহ্বান করিতেন, এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দু দেবমূর্ত্তি, উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন, পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। এই দিনে, সর্ব্বাপেক্ষা

বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত হইত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য অতিথি অভ্যাগতদিগকে দেওয়া যাইত। দ্বিতীয় দিনে, বিষ্ণু এবং তৃতীয় দিনে, শিবের মূর্ত্তি মন্দিরের শোভা সম্পাদন করিত। প্রথম দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ, এই এক এক দিনে বিতরিত হইত। চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দানকার্য্য আরম্ভ হইত। কুড়ি দিন, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধেরা, দশ দিন, হিন্দু দেবতা-পূজকেরা এবং দশ দিন, পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা দানগ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃমাতৃহীন ও আত্মীয়বন্ধু-শূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা হইত। সমুদয়ে ৭৫ দিন পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্য চলিত। শেষ দিনে মহারাজ শিলাদিত্য, আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তা-খচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক চীরশোভী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ পরিগ্রহ করিতেন। এই বহুমূল্য আভরণরাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত। চীর ধারণ করিয়া, মহারাজ শিলাদিত্য যোড়হাতে গম্ভীরস্বরে কহিতেন, "আজ আমার সম্পত্তিরক্ষার সমুদয় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষ-ক্ষেত্রে আজ আমি সমুদয় দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট পুণ্যসঞ্চয়ের মানসে, ভবিষ্যতেও আমি, এইরূপে দান করিবার জন্য,

আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রাখিব। এই-রূপে পুণ্যভূমি প্রয়াগে, সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ, মুক্তহস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্যরক্ষা ও বিদ্রোহদমন জন্য, হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত।

পবিত্র প্রয়াগে, পবিত্রস্বভাব চীনদেশীয় শ্রমণ হিউএন্থ্ সঙ্গ্ এইরূপ মহোৎসব দেখিয়া, পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া, ভারতের প্রাচীন ভূপতিগণ, আপনাদিগকে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী বলিয়া, বিবেচনা করিতেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজারা, ধর্ম্মসঞ্চয়মানসে, ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু উহার সহিত রাজনৈতিক বিষয়েরও কিয়দংশে সংস্রব ছিল। ভারতের রাজগণ, এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের আয়ত্ত ছিলেন। ইহাঁদিগকে সকল সময়ে, ঐ উভয় দলের পরামর্শানুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। যাহাতে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে, কোন রূপ অসন্তোষের আবির্ভাব না হয়, যাহাতে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধেরা, সর্ব্বদা রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা করেন, তৎপ্রতি রাজাদের দৃষ্টি ছিল। ঐ উৎসবে, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ, উভয়কেই সমান আদরের সহিত ধন দান করা হইত। উভয়েই, সমান আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেন। এজন্য, ইহাঁরা সর্ব্বদা দান-

বীর রাজার কুশলকামনা করিতেন, এবং যে রাজ্যে এমন অসাধারণ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সে রাজ্যের উন্নতির উপায়নির্দ্ধারণে, সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। এদিকে সাধারণেও, ঐ অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া, রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। এই রূপে, রাজা, সাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেন। অধিকন্তু, যে সকল সাহসী দস্যু, রাজার ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া, শেষে রাজ-সিংহাসনগ্রহণে উদ্যত হয়, তাহারা সন্তোষক্ষেত্রের দানে, রাজার অর্থাভাব দেখিয়া, আপনাদের সাহসিক কার্য্যে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট থাকিত। রাজনৈতিক ফল যাহাই হউক না কেন, সন্তোষক্ষেত্রের উৎসবে আর্য্য-কীর্ত্তির মহিমা অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম হয়।

অসাধারণ পিতৃভক্তি।

কৃষ্ণকুমারী, মিবারের রাণা ভীমসিংহের কন্যা। সৌন্দর্য্যগৌরবে, তিনি অতুলনীয়া ছিলেন। লোকে তাঁহাকে "রাজস্থানের কুসুম" বলিয়া গৌরবান্বিত ও সম্মানিত করিত। তাঁহার যেমন অসাধারণ রূপ-লাবণ্য, তেমনি অনুপম পিতৃভক্তি ছিল। কৃষ্ণকুমারী ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে, রাজা ভীমসিংহ মাড়বা-

রের অধিপতির সহিত, কন্যার পরিণয়সম্বন্ধ স্থির করেন। কিন্তু, ইহার মধ্যে মাড়বাররাজের পরলোক-প্রাপ্তি হয়। সুতরাং, ভীমসিংহ, জয়পুরের অধিপতি জগৎসিংহের হস্তে, দুহিতারত্ন সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন। মাড়বারের পরবর্ত্তী ভূপতি মানসিংহ, ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, সসৈন্য মিবারে আসিয়া, রাজস্থান-কুসুম কৃষ্ণার পাণিগ্রহণার্থী হন। এ দিকে, মহারাজ সিন্ধিয়া, জয়পুররাজের পরিবর্ত্তে, মাড়বাররাজের সহিত কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ দিতে, মহারাজ ভীমসিংহকে অনুরোধ করেন। জগৎসিংহের সহিত সিন্ধিয়ার শত্রুতা ছিল। ঐ শত্রুতার বশবর্ত্তী হইয়া, সিন্ধিয়া, জয়-পুরের অধিপতিকে বঞ্চিত করিয়া, মাড়বাররাজের প্রার্থনার পূরণ করিবার জন্য, মহারাজ ভীমসিংহকে আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভীম-সিংহ সম্মত হইলেন না। সিন্ধিয়া সৈন্যদলসহ উদয়-পুরে আসিয়া, একটি গিরিসঙ্কটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। উদয়পুর ও জয়পুরের সৈন্যগণ, তাঁহার পরাক্রম খর্ব্ব করিতে পারিল না। ভীমসিংহ, পরি-শেষে একলিঙ্গের মন্দিরে, সিন্ধিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া, প্রবলের অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল। রাণা, জয়পুররাজের দূতকে বিদায় দিলেন। জগৎসিংহ, এ অপমান সহিতে

পারিলেন না। অবিলম্বে, তাঁহার বহুসংখ্য সৈন্য মিবারে উপস্থিত হইল। এ দিকে মাড়বাররাজ মানসিংহও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। বীরভূমি, অপূর্ণ-বিকশিত পবিত্র রাজস্থানকুসুমের জন্য নরশোণিতে রঞ্জিত হইতে লাগিল।

এই যুদ্ধে মানসিংহ, প্রথমে জয়ী হইতে পারিলেন না। এক দল লোক প্রবল হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিল। ইহারা, আর এক জনকে অধিপতি করিয়া, মানসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মান-সিংহ, সৈন্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে আসিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, মাড়বারের অধিকাংশ লোক বিপক্ষের দলে যাইয়া মিশিল। এইরূপ বিশ্বাস-ঘাতকতায় মানসিংহ, ক্ষোভে, রোষে ও বিরাগে হস্ত-স্থিত অসি দ্বারা, স্বীয় বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু, তাঁহার কয়েক জন বিশ্বাসী সর্দ্দার, অসি কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজ-ধানীতে স্থানান্তরিত করিলেন। শত্রুগণ, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, তদীয় রাজধানী আক্রমণ করিল। পরাক্রান্ত রাঠোরগণ, সাহস ও বীরত্বের সহিত নগর রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু শেষে, তাহাদের রাজধানী শত্রুর হস্তগত ও বিলুণ্ঠিত হইল। মানসিংহ যোধগড়ে আশ্রয় হইলেন। এই দুর্গ, অভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

উপস্থিত সঙ্কটাপন্ন সময়ে, দুর্গের ঐ গৌরব সর্ব্বাংশে রক্ষিত হইল। মাড়বারের রাজধানী আক্রমণকারী সৈন্যগণের পদানত হইল বটে, কিন্তু যোধগড় অটল ও অজেয় রহিল।

এই বিপ্লবের সময়ে, একটি নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক, ঘটনাক্ষেত্রে আবির্ভূত হইল। ইহার নাম আমির খাঁ। আমির খাঁ জাতিতে পাঠান। পাপের ভয়াবহ রাজ্যে, যত প্রকার দুষ্প্রবৃত্তি আছে, তৎসমুদয়েই আমির খাঁর প্রকৃতি সংগঠিত হইয়াছিল। আমির খাঁ, প্রথমে মানসিংহের বিপক্ষের পক্ষে ছিল। মানসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে, ঐ বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল। তদীয় সৈন্যগণ নির্ম্মূল হইয়া গেল। আমির খাঁ, অম্লানভাবে, এইরূপে পাপজনক কার্য্য করিয়া, মানসিংহের দলে মিশিল।

এইরূপে বিশ্বাসঘাতকের বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ণ কার্য্যের এক অংশ সম্পন্ন হইল। এখন আমির খাঁ, উহা অপেক্ষাও, আর এক ভয়ঙ্কর অংশ সম্পাদন করিতে, হস্ত প্রসারণ করিল। সৌন্দর্য্যময় রাজস্থান-কুসুমের জন্য, এখনও জয়পুর ও মাড়বারের অধিপতি, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিয়াছিলেন। এখনও উভয় সৈন্যদলের আক্রমণে, মিবার অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা-

পূর্ণ হইতেছিল। দুরন্ত পাঠান, এই সময়ে, উদয়পুরের রাণার পরামর্শদাতা হইয়া উঠিল। তাহার কুপরামর্শে রাণা, অপরিস্ফুট হৃদয়রঞ্জন কুসুমটিকে বৃন্তচ্যুত করিয়া ফেলিতে, ইচ্ছা করিলেন। রাজ্যে শান্তিস্থাপন জন্য, তিনি, এই উপায়ই প্রশস্ত বোধ করিয়াছিলেন, কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রে এই উপায়েই, মিবারের গৌরবরক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। অবিলম্বে, এই সঙ্কল্পসিদ্ধির আয়োজন হইল। মহারাজ দৌলৎ সিংহ, রাণার এক জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। উদয়পুরের সম্মানরক্ষার জন্য, ঐ ঘোরতর পাপকার্য্য সাধন করিতে, প্রথমে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল। প্রস্তাব শুনিয়াই, দৌলৎ সিংহ, অধীরহৃদয়ে, তীব্রস্বরে কহিলেন, "যে জিহ্বা দিয়া এমন কথা বাহির হয়, সে জিহ্বাকে ধিক্, আর যে রাজভক্তি এইরূপে রক্ষিত হয়, সে রাজভক্তিকেও ধিক্।" শেষে রাণার ভ্রাতা, যৌবনদাস, তরবারি হস্তে করিয়া, অতুললাবণ্যবতী, ষোড়শী বালার শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণকুমারী নিদ্রিত ছিলেন, ঈষদুদ্ভিন্ন কমলদলের ন্যায় তাঁহার কোমল দেহের সৌন্দর্য্য, শয্যার অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছিল। এ শোভায়, ঘাতক স্তম্ভিত হইলেন; ক্ষোভে, রোষে ও বিরাগে তাঁহার হৃদয় অধীর হইল, অবশ হস্ত হইতে অসি পড়িয়া গেল। ষড়যন্ত্র ক্রমে প্রকাশ পাইল। ক্রমে উহা, কৃষ্ণ-

কুমারী ও তদীয় জননীর শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। মাতা, বিষাদে অধীর হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, কৃষ্ণকুমারী কিছুমাত্র কাতর হইলেন না, এ ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রেও, ধীরতার সীমা অতিক্রম করিলেন না। তিনি অকাতরে, প্রসন্নমুখে মাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কহিলেন, "মা! ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য, ক্ষণস্থায়ী দুঃখে কাতর হইতেছ কেন? আমি কি, তোমার কন্যা নই? আমি, কেন, মৃত্যুকে ভয় করিব? এ অবস্থায়, মৃত্যু আমার নিকট পরম সুহৃৎ! ক্ষত্রিয়বালা, আত্ম-সম্মানরক্ষার জন্য, আত্মপ্রাণ পরিত্যাগ করিতেই, এই পৃথিবীতে আসিয়া থাকে।" তেজস্বিনী রাজপুতবালা, এইরূপ ধীরভাবে আত্মত্যাগ করিয়া, রাজ্যের অমঙ্গল দূর করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। রাণার আদেশে, অনুচর বিষপূর্ণ পাত্র লইয়া, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণা, পিতার আজ্ঞায়, অম্লানভাবে তাহা পান করিলেন। আর এক পাত্র আসিল, কৃষ্ণা পূর্ব্বের ন্যায় অম্লানভাবে তাহাও নিঃশেষ করিয়া, পিতৃভক্তির পরা-কাষ্ঠা দেখাইলেন। এইরূপে, দুই বার বিষপানেও, যখন কৃষ্ণার প্রাণবায়ুর অবসান হইল না, দেববাঞ্ছনীয়, পবিত্র কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িল না, তখন "কুসুম্ভ-রস" নামক আর এক প্রকার তীব্র হলাহল প্রস্তুত হইল। কৃষ্ণকুমারী পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লমুখে, ঈশ্বরের নাম

স্মরণ করিতে করিতে, উহা পান করিলেন। এ বার তাঁহার গাঢ় নিদ্রা আসিল; এ গভীর নিদ্রা হইতে, তিনি, আর জাগরিত হইলেন না। পিতৃভক্তিপরায়ণা ষোড়শবর্ষীয়া অবলা, অকাতরে, অম্লানভাবে, আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, স্বর্গে গমন করিলেন। ভূলোকে তাঁহার অনন্তগৌরবময় কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিল।

রমণীর রাজধর্ম্মপালন।

ভারতবর্ষের মধ্যভাগে, এলাহবাদ হইতে প্রায় এক শত ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে গড়মণ্ডল নামে একটি রাজ্য ছিল। খ্রীঃ ৩৫৮ অব্দে যদুরায় নামক এক জন রাজপুত, এই রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করেন। সোহাগপুর, ছত্রিশগড়, সম্ভলপুর প্রভৃতি জনপদ লইয়া, গড়রাজ্য সংগঠিত হয়। সোহাগপুর, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত। ঐ স্থানের অধিকাংশ অরণ্যময়। প্রকৃতির অনুকূলতাবশতঃ উহা ধনসম্পত্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। ছত্রিশগড়, গোণ্ডবন প্রদেশের অন্তঃপাতী। পূর্ব্বে, উহা রত্নপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ ভূভাগের কিয়দংশ অরণ্য ও পর্ব্বতমালায় সমাবৃত।

গড়মণ্ডল রাজ্য মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। উহার কোথাও জনপূর্ণ পল্লী, সুন্দর জলাশয়, সুরম্য উপবনপ্রভৃতি অপূর্ব্ব দৃশ্য বিকাশ করিয়া দিতেছে, কোথাও স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গিণী, ধীরে ধীরে তরঙ্গরঙ্গ বিস্তার করিয়া বৃক্ষসমাকীর্ণ বনভূমির প্রান্তদেশে, রজতমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে, কোথাও নবীন লতাসমূহ, প্রফুল্ল কুসুমে সজ্জিত হইয়া, সৌন্দর্য্যগৌরবের পরিচয় দিতেছে, কোথাও অটল পর্ব্বত, আপনার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া, বিরাট্ পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কোথাও বা প্রস্রবণসমূহ সুশীতল, পরিষ্কৃত জল দিয়া, অরণ্যচর জীবগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। গড়মণ্ডলের রাজধানী গড় নগর, নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে, জব্বলপুরের প্রায় পাঁচ মাইল অন্তরে ছিল। চারি দিক পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত থাকাতে, শত্রুপক্ষ সহজে এই নগর আক্রমণ করিতে পারিত না। মুসলমান রাজগণ যখন দিল্লীর সিংহাসন হস্তগত করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন জনপদে আপনাদের ক্ষমতা প্রসারিত করিতেছিলেন, এক রাজ্যের পরে আর এক রাজ্য, যখন তাঁহাদের বিজয়পতাকায় শোভিত হইতেছিল, তখন গড়মণ্ডল, আপনার স্বাধীনতা অক্ষত রাখিয়াছিল। মুসলমানভূপতিগণের সৈন্যসাগরের প্রবল তরঙ্গ, এই

রাজ্যের ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, গড় নগরের দৈর্ঘ্য তিন মাইল ও বিস্তার এক মাইল ছিল।

খ্রীঃ ১৫৩০ অব্দে, যদুরায়ের বংশীয় দলপৎ শা, গড়-মণ্ডলের অধিপতি হন। এত দিন, গড় নগরে ইহাঁদের রাজধানী ছিল। কিন্তু দলপৎ শা, সিংহলগড় নামক একটি পার্ব্বত্য দুর্গে, আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময়ে, মহবারাজ্যে, ক্ষত্রিয় ভূপতিগণ আধিপত্য করিতেন। ইহাঁদের অধিকার, এক সময়ে, সিংহলগড় ও কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দুর্গাবতী, উক্ত মহবা-রাজ্যের একজন ক্ষত্রিয় ভূপতির কন্যা।

দুর্গাবতীর অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও অসাধারণ তেজ-স্বিতা ছিল। কথিত আছে, তাঁহার ন্যায় রূপলাবণ্য-বতী মহিলা, তৎকালে ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। দলপৎ শা, এই সৌন্দর্য্যশালিনী কামিনীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু, দুর্গাবতীর পিতা, দলপৎ শার বংশের হীনতার উল্লেখ করিয়া, উপস্থিত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। দলপৎ, অতি সুপুরুষ ও অতি তেজস্বী ছিলেন। সৌন্দর্য্যের সহিত তেজস্বিতার সংযোগ থাকাতে, দলপতের খ্যাতি,চারি দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। তেজস্বিনী দুর্গাবতী, চিরকাল তেজস্বিতার পক্ষপাতিনী ছিলেন। গড়মণ্ডলের অধিপতিতে তেজ-

স্বিতার সহিত সৌন্দর্য্যের সম্মিলন দেখিয়া, তিনি, তাঁহার সহিতই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিলেন।

দলপৎ, দুর্গাবতীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবিলম্বে, সিংহলগড়ে বহুসংখ্য সৈন্য একত্র হইল। দলপৎ, ঐ সৈন্যদল সঙ্গে করিয়া, মহবারাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে মহবারাজের পরাজয় হইল। দলপৎ, দুর্গাবতীকে লইয়া, আপনার রাজধানীতে আসিলেন। তেজস্বিনী দুর্গাবতী, তেজস্বী দলপতের সহধর্ম্মিণী হইয়া, সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বিবাহের চরি বৎসর পরে, বীরনারায়ণ নামে একটি পুত্রসন্তান রাখিয়া, দলপৎ শা লোকান্তরিত হইলেন। এই সময়ে, বীরনারায়ণের বয়স তিন বৎসর। বিধবা দুর্গাবতী, আপনার শিশু পুত্রের নামে স্বয়ং গড়রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। অধরনামক এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। দুর্গাবতী, মন্ত্রিবরের পরামর্শ শুনিয়া, শাসনকার্য্য চালাইতেন। তাঁহার শাসনগুণে ক্রমে গড়মণ্ডলের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি, জব্বলপুরের নিকট একটি বৃহৎ জলাশয় খনন করাইলেন। দেখাদেখি, তাঁহার একটি পরিচারিকাও ঐ জলাশয়ের

নিকটে আর একটি জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করিল। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। পরিচারিকা, দুর্গাবতীর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিল, যে সকল লোক, বৃহৎ জলাশয় খনন করিতেছে, তাহারা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে, আপনাদের কার্য্য শেষ করিবার পূর্ব্বে, নিকটবর্ত্তী এক স্থান হইতে, এক এক ঝুড়ি মাটি কাটিয়া ফেলিবে। দুর্গাবতী সম্মত হইলেন। তাঁহার আদেশে পরিচারিকার প্রার্থনানুসারে কার্য্য হইতে লাগিল। ক্রমে দুর্গাবতীর প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ জলাশয়ের নিকটে, আর একটি সুন্দর জলাশয় প্রস্তুত হইল। প্রধান অমাত্য অধরও জব্বলপুরের তিন মাইল দূরে, একটি বৃহৎ জলাশয় প্রস্তুত করাইলেন। মণ্ডলনগরে দুর্গাবতীর একটি হস্তিশালা ছিল। কথিত আছে, সে স্থানে চৌদ্দ শত হস্তী থাকিত। যাহা হউক, দুর্গাবতীর গড়রাজ্যে সাধারণের হিতকর নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। প্রজারা সন্তুষ্ট হইল। তাহারা,দুর্গাবতীকে আরাধ্যা মাতা ও রক্ষাকর্ত্রী দেবীর ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিল। দুর্গাবতী পনর বৎসর, পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিলেন। তাঁহার শাসন-গৌরব চারিদিকে বিস্তৃত হইল। গড়মণ্ডলের ইতিহাস, অবলার অক্ষয় কীর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

মোগল সম্রাট আকবর শাহ অবাধ্য আমীর ও

ভূস্বামীদিগকে শাসন করিবার জন্য, নানাস্থানে সেনা-পতি নিযুক্ত করেন। আসফ খাঁ নামক এক জন উদ্ধতস্বভাব সেনাপতি, নর্ম্মদার তটবর্ত্তী প্রদেশ শাসনের জন্য, প্রেরিত হন। আসফ, গড়মণ্ডলের সমৃদ্ধির বিষয় অবগত ছিলেন, এখন উহা হস্তগত করিবার জন্য, যত্নশীল হইলেন। আকবর শাহ, নিজের অধিকার বাড়াইতে অনিচ্ছুক ছিলেন না। তিনি, সেনাপতিকে গড়রাজ্য অধিকার করিতে, উৎসাহ দিতে লাগিলেন। মন্ত্রিবর অধর দিল্লীতে যাইয়া, এই আক্রমণের নিবারণ জন্য, অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। আসফ খাঁ, খ্রীঃ ১৫৬৪ অব্দে, ছয় হাজার অশ্বারোহী, বার হাজার পদাতি ও কতকগুলি কামান লইয়া, গড়মণ্ডলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অবিলম্বে এই আক্রমণের সংবাদ, গড়রাজ্যে প্রচারিত হইল। রাজ্যের বালক, বৃদ্ধ, বনিতা, সকলেই এই সংবাদে ভীত হইয়া উঠিল। কিন্তু তেজস্বিনী দুর্গাবতীর হৃদয়ে, কিছুমাত্র ভয়ের আবির্ভাব হইল না। তিনি, সাহসসহকারে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে, গড়রাজ্যে বহুসংখ্য সৈন্য একত্র হইল। দুর্গাবতীর পুত্র বীরনারায়ণের বয়স এই সময়ে আঠার বৎসর হইয়াছিল। এই অষ্টাদশবর্ষীয় যুবকও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, নির্ভয়ে যুদ্ধ-

যাত্রীর দলে মিশিলেন। দুর্গাবতী, সৈন্যদিগকে একত্র করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি, স্বয়ং যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, মাথায় রাজমুকুট, এক হাতে শাণিত শূল ও অপর হাতে ধনুর্ব্বাণ লইয়া, হস্তীতে উঠিলেন। কামিনীর কোমল হৃদয়, এখন রাজধর্ম্মের প্রতিপালন জন্য, অটল হইল। দুর্গাবতী, অটলভাবে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, গম্ভীরস্বরে সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। বীরজায়ার বাক্যে, উৎসাহিত হইয়া, গড়মণ্ডলের সৈন্যগণ, ভয়ঙ্কর শব্দে চারি দিক কম্পিত করিয়া তুলিল। তেজস্বিনী দুর্গাবতী, শত্রুকে দেশ হইতে দূর করিবার জন্য, ঐ উৎসাহিত সৈন্য-দলের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন।

দুর্গাবতী, আট হাজার অশ্বারোহী, দেড় হাজার হস্তী ও বহুসংখ্য পদাতির সহিত সিংহলগড়ের নিকটে শত্রুর সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন। তিনি, প্রবল-পরাক্রমে দুই বার, আসফ খাঁর সৈন্য আক্রমণ করি-লেন, দুই বারেই তাঁহার জয়লাভ হইল। যুদ্ধে শত্রু-পক্ষের ছয় শত অশ্বারোহীর প্রাণত্যাগ হইল, শেষে অবশিষ্ট সৈন্য রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া, পলায়ন করিল। দুর্গাবতী, তৃতীয় বার শত্রুসেনার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। আসফ খাঁর সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। দুর্গাবতী, অবিচলিত সাহসের সহিত বিপ-

ক্ষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। শেষে সূর্য্য অস্তগত হইল দেখিয়া, দুর্গাবতী আপনার সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করিতে অনুমতি দিলেন।

এই বিশ্রামসুখই, তেজস্বিনী দুর্গাবতীর পক্ষে, অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিল। গড়মণ্ডলের সৈন্যগণ, সেই সময়ে সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা করাতে দুর্গাবতী মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। কিছুকাল বিশ্রামের পর, সেই রাত্রিতেই শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে, তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার ইচ্ছানুসারে কার্য্য হইলে, আসফ্ খাঁর সৈন্য নিঃসন্দেহ নির্ম্মূল হইত। কিন্তু, বীররমণীর এই ইচ্ছা ফলবতী হইল না। সৈন্যগণের সকলেই, এই প্রস্তাবে অসম্মত হইল, সকলেই তাঁহাকে বিনয়সহকারে, নিশীথে বিপক্ষসৈন্য আক্রমণের জন্য, প্রস্তুত হইতে, নিষেধ করিতে লাগিল। দুর্গাবতী, অগত্যা এই প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। এদিকে, আসফ খাঁ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। যুদ্ধে দুইবার পরাজিত হওয়াতে, তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল। এখন গড়মণ্ডলের সৈন্যগণের বিশ্রামের সংবাদে, তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া, কামান লইয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। প্রভাত হইতে না হইতেই, আসফ খাঁ, নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। দুর্গাবতীর

সৈন্যগণ, গড়নগরের বার মাইল পূর্ব্বে, একটি সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের নিকটে, অবস্থিতি করিতেছিল। আসফ খাঁ, রাত্রিকালেই তাহাদিগকে সেই স্থানে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু, তখন আসফ খাঁর কামান আসিয়া পহুঁছে নাই। প্রথম আক্রমণে আসফ, দুর্গাবতীর পরাক্রমে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, পশ্চাৎ হটিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে, কামান সকল আসিয়া পহুঁছিলে, বিপক্ষেরা আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দুর্গাবতী, গিরিসঙ্কটের প্রবেশপথে হস্তিপৃষ্ঠে থাকিয়া, ঐ আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ অসামান্যসাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু, অবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণে, তাহারা অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। গোলার পর গোলার আঘাতে, সকলে কাতর হইয়া পড়িল। কুমার বীরনারায়ণ, এই সময়ে অসাধারণ বিক্রম দেখাইতে লাগিলেন। অষ্টাদশ বর্ষবয়স্ক তরুণ বীরপুরুষের পরাক্রম দর্শনে, বিপক্ষগণ স্তম্ভিতপ্রায় হইল। কিন্তু শেষে বহুসংখ্য বিপক্ষের আক্রমণে, বীরনারায়ণ আহত হইয়া, পতনোন্মুখ হইলেন। দুর্গাবতী প্রাণাধিক পুত্রের কাতরতা দর্শনে, যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন না। তিনি, পুত্রকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরাক্রমে রণকৌশল দেখাইতে লাগিলেন। বিপক্ষেরা

অসময়ে, অতর্কিতভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতেও তিনি কাতর হন নাই। স্নেহের অবলম্ব, প্রীতির পুত্তলী তনয়, অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও হত-চেতন হইয়াছে, তাহাতেও তাঁহার হৃদয় অধীর হয় নাই। দুর্গাবতী অকাতরে, ধীরভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিৎ ছিল। রাত্রিকালে ঐ নদী প্রায় শুকাইয়া গিয়া-ছিল। কিন্তু, প্রভাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ে, উহা জলপূর্ণ হইয়া, বৃহৎ স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করিল। দুর্গাবতী, উহা দেখিয়া, স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সৈন্যগণ, স্রোতস্বতী পার হইয়া, পশ্চাতে যাইয়া, যুদ্ধ করিতে পারিবে না। বিপক্ষের কামানের মুখে থাকিয়াই, সৈন্যদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু গোলার আঘাতে, তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য, একে একে বীরশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। অধিকাংশ সৈন্যের শবরাশিতে, সমরস্থল ভীষণতর হইয়া উঠিল। চারি দিকের বিপক্ষসৈন্য, উদ্বেল সাগরের ন্যায় ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে করিতে, ক্রমে তাঁহার সম্মুখে আসিতে লাগিল। তথাপি তেজস্বিনী দুর্গাবতী ভীতা হইলেন না। তিনি, কেবল তিন শত মাত্র পদাতি লইয়া, ঐ উদ্বেল সৈন্য-সাগরের গতিরোধে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে, শত্রুর নিক্ষিপ্ত একটি সুতীক্ষ্ণ বাণে, হঠাৎ তাঁহার এক

ক্ষ বিদ্ধ হইল। দুর্গাবতী, ঐ বাণ বলপূর্ব্বক বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। শর নিঃসারিত না হইয়া, চক্ষুকোটরেই রহিল। দুর্গাবতী ইহাতেও কাতর না হইয়া, গিরি-সঙ্কটরক্ষার জন্য, পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহার পর, আর একটি তীর প্রবলবেগে তাঁহার গ্রীবাদেশে আসিয়া পড়িল। দুর্গাবতী, এইরূপ পুনঃপুনঃ শরাঘাতে কাতর হইলেন। চারি দিক, তাঁহার নিকট অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি, জয়াশায় জলাঞ্জলি দিলেন। যে অভি-প্রায়ে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে অভিপ্রায়ে, মহাবিক্রমে বিপক্ষসৈন্য আক্রমণ করিয়া-ছিলেন, যে অভিপ্রায়ে, সমরস্থলে প্রাণপ্রিয় পুত্রের শোচনীয় দশাও, অকাতরে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন, সে অভিপ্রায়সিদ্ধির আর কোনও সম্ভাবনা রহিল না। বীররমণী, এ অবস্থাতেও, ভীরুর ন্যায় যুদ্ধভূমি হইতে পলায়ন করিলেন না, ভীরুর ন্যায় বীরধর্ম্মে জলা-ঞ্জলি দিয়া, বিপক্ষের পদানত হইলেন না। তাঁহার হস্তিচালক, পশ্চাতের নদী পার হইয়া যাইতে, তাঁহার নিকটে বারংবার অনুমতি চাহিতে লাগিল। কিন্তু, দুর্গাবতী তাহাতে সম্মত হইলেন না। বীরাঙ্গনা, বীর-ধর্ম্মরক্ষার জন্য, সমরক্ষেত্রেই দেহপাত করিতে, কৃত-

নিশ্চয় হইলেন। যখন আহত স্থান হইতে অনর্গল শোণিতধারা বাহির হইয়া, তাঁহার দেহ প্লাবিত করিল, শরীর স্তম্ভিত হইয়া আসিল, তেজ ক্ষীণতর হইয়া পড়িল, তখন তিনি অম্লানবদনে, হস্তিচালকের নিকট হইতে, বলপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ অসি গ্রহণ করিলেন এবং অম্লানবদনে, উহা স্বীয় দেহে প্রবেশিত করিয়া, রুধিরে রঞ্জিত করিয়া ফেলিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে, তাঁহার লাবণ্যময়, কমনীয় দেহ বিচেতন ও বিবর্ণ হইয়া পড়িল। ছয় জন সৈনিকপুরুষ দুর্গাবতীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা, এই অসমসাহসের কার্য্য দর্শনে,জীবনের আশা ছাড়িয়া, শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল।

যে স্থানে দুর্গাবতী প্রাণত্যাগ করেন, পথিকগণ এখন পর্য্যন্ত, সেই স্থানের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উহা একটি সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট। উহার নিকটে, দুইটি অতি প্রকাণ্ড গোলাকার পাথর রহিয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস, দুর্গাবতীর রণডঙ্কা প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক, ঐ গিরিসঙ্কটের সহিত প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার সংস্রব থাকাতে, উহা একটি দর্শনীয় স্থানের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ঐ স্থানের গম্ভীর দৃশ্য দেখিলে, মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে।

যুদ্ধের সময়ে, দুর্গাবতীর লোকে, আহত বীরনারায়ণকে, বিপক্ষের অজ্ঞাতসারে, চৌরগড়নামক দুর্গে আনিয়াছিল। আসফ খাঁ, শেষে ঐ দুর্গও আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে বীরনারায়ণ নিহত হইলেন। দুর্গস্থিত মহিলাগণ, শত্রুর হস্তে সম্মান নষ্ট হইবার আশঙ্কায়, আবাসগৃহে আগুন লাগাইয়া দিল। আসফ খাঁ দুর্গজয় করিলেন। এদিকে রমণীগণ, জ্বলন্ত অনলশিখায় অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন করিল।

মোগলসৈন্য, গড়নগর লুণ্ঠন করিয়া, অনেক অর্থ পাইয়াছিল। আসফ খাঁ, বিশ্বাসঘাতক হইয়া, অনেক সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। কথিত আছে, তিনি দুর্গাবতীর ধনাগারে, একশতটি স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলস পাইয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত, সূতগণ, দুর্গাবতীর বীরত্বকাহিনী, গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়া, বীণাসংযোগে নানা স্থানে গাহিয়া বেড়ায়। কালের কঠোর আক্রমণে, গড়রাজ্য এখন বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তেজস্বিনী দুর্গাবতীর গৌরব কখনও বিলুপ্ত হইবে না।

ভারতে ভারতীর অপূর্ব্ব পূজা।

নালন্দায় বেদমাতা ভারতীর পূজা, ভারতের একটি প্রধান কীর্ত্তি। নালন্দা গয়ার নিকটবর্ত্তী। কেহ কেহ, বর্ত্তমান বড়গাঁওকে প্রাচীন নালন্দা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহা হউক, নালন্দা বৌদ্ধদিগের পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এই স্থানে একটি আম্রকানন ছিল। কোন ধনাঢ্য বণিক্, উহা বুদ্ধকে দান করেন। বুদ্ধ, ঐ আম্রকাননে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ক্রমে ঐ স্থানে, একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ধর্ম্মপরায়ণ বৌদ্ধ ভূপতিগণের দানশীলতায়, ক্রমে এই বিদ্যামন্দিরে সম্প্রসারিত ও উন্নত হইয়া উঠে। নালন্দার বিদ্যামন্দির, এই সময়ে, সমগ্র ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধ বিদ্যালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধদিগের আঠারটি ভিন্ন ভিন্ন দলের দশ হাজার শ্রমণ, এই খানে থাকিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসাবিদ্যার আলোচনা করিতেন। মনোহর বৃক্ষবাটিকায়, এই মহাবিদ্যালয়, পরিশোভিত ছিল। ছয়টি চারিতল অট্টালিকায়, শিক্ষার্থিগণ বাস করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য, একশতটি গৃহ ছিল। এতদ্ব্যতীত, শাস্ত্রজ্ঞদিগের পরস্পরসম্মিলনের

জন্য, মধ্যস্থানে অনেকগুলি বড় বড় গৃহ সুসজ্জিত থাকিত। মহারাজ শিলাদিত্য, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের আহার, পরিধেয় ও ঔষধাদির সমস্ত ব্যয়নির্ব্বাহ করিতেন। নগরের কোলাহল, ঐ স্থানের শান্তিভঙ্গ করিত না। সাংসারিক প্রলোভন, উহার পবিত্রতা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইত ন। শিক্ষার্থিগণ, ঐ পবিত্র শান্তিনিকেতনে, প্রশান্তভাবে শাস্ত্রচিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন। নালন্দার পবিত্র বিদ্যালয়, কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না। অভ্যন্তরীণ সৌন্দ-র্য্যেও, উহা সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। উহার শিক্ষকগণ, জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন, উহার শিক্ষার্থিগণ, শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রচিন্তায় প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ বিদ্যামন্দিরের প্রধান অধ্যাপকের নাম শীলভদ্র। ইনি, কেবল বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন না, শাস্ত্রজ্ঞানেও বৃদ্ধ বলিয়া সাধারণের নিকটে সম্মানিত ছিলেন। সমস্ত শাস্ত্রই, ইঁহার আয়ত্ত ছিল। অসাধারণ ধর্ম্মপরতায়, অসাধারণ দূরদর্শিতায় ও অসাধারণ অভিজ্ঞতায়, এই বর্ষীয়ান্ পুরুষ, নালন্দার পবিত্র বিদ্যালয় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

চীনের প্রসিদ্ধ পর্য্যটক হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ এই সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি, ভারতীর ঐ লীলা-ভূমিতে যাইতে নিমন্ত্রিত হন। হিউএন্থ্ সঙ্গ্ বিনয়ের

সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্ব্বক নালন্দায় আসিলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশসময়ে, দুই শত জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণ, আপনাদের প্রসিদ্ধ অতিথিকে যথোচিত অভ্যর্থনাসহকারে, গ্রহণ করিলেন। ইহাদের পশ্চাতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ, কেহ ছাতা ধরিয়া, কেহ নিশান উড়াইয়া, কেহ বা, গম্ভীরস্বরে অতিথির প্রশংসাগীতি গাহিয়া, তাঁহাকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন। এইরূপ আদর ও সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়া, হিউএন্ থ সঙ্ বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যক্ষের নিকটে আসিলেন। শীলভদ্র বেদীতে বসিয়াছিলেন, হিউএন্ থ্ সঙ্ বেদীর সম্মুখে আসিয়া, বিনয়নম্রতার সহিত বর্ষীয়ান্ পুরুষকে অভিবাদন করিলেন। এই অবধি, হিউএন্ থ্ সঙ্ শীলভদ্রের শিষ্যশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। যিনি চীনসাম্রাজ্যে সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ববিৎ বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, দেশে বিদেশে পরিভ্রমণ করিয়া, নানাবিষয়ে, অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন, সাধারণে, যাঁহার অসাধারণ জ্ঞানগরিমার নিকটে অবনতমস্তক হইত, তিনি জ্ঞানসঞ্চয়মানসে, ভারতের এই অভিজ্ঞ পুরুষের শিষ্য হইলেন। বিদ্যালয়ের একটি উৎকৃষ্ট গৃহে, হিউএন্ থ্ সঙ্‌কে স্থান দেওয়া হইল। দশ জন লোক, তাঁহার অনুচর ও দুইজন শ্রমণ, নিয়ত তাঁহার শুশ্রূষার্থ নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ শিলাদিত্য, তাঁহার দৈনন্দিন ব্যয়-

নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। হিউএন্‌ থ্‌সঙ্গ্‌ সক-লের আদরণীয় হইয়া, পাঁচ বৎসর, নালন্দার বিদ্যালয়ে ছিলেন, পাঁচ বৎসর, মহাপ্রজ্ঞ শীলভদ্রের পদতলে বসিয়া, পাণিনির ব্যাকরণ, ত্রিপিটক ও ব্রাহ্মণদিগের সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া-ছিলেন। এখন এই পবিত্র বিদ্যামন্দিরের পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্য নাই। কালের কঠোর আক্রমণে, ভারতীর এই লীলাভূমি, এখন ভগ্ন দশায় পতিত রহিয়াছে।

অসাধারণ পরোপকার।

সিপাহিযুদ্ধের সময়ে, বুঁদীর রাজার ধর্ম্মপরায়ণা বনিতা, আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, নিরাশ্রয় ইউরোপীয় কুলকামিনী ও শিশুদিগকে আশ্রয় দিয়া, অসাধারণ পরোপকারের পরিচয় দেন। বুঁদীরাজ, সিপাহিদিগের সহিত মিলিত হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন, এদিকে তাঁহার দয়াশীলা পত্নী শুনিতে পাই-লেন, ইউরোপীয়গণ দলে দলে নিহত হইতেছে। যে সকল কুলকন্যা ও শিশুসন্তান, এক সময়ে, সুখসৌ-ভাগ্যে লালিত হইয়াছিল, তাহারা, এখন খাদ্যবিহীন ও বস্ত্রবিহীন হইয়া, আশ্রয়স্থানের অভাবে, দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিমের মধ্যে, নিকট-

বর্ত্তী জঙ্গলে পড়িয়া রহিয়াছে। এই শোচনীয় দুর্গতির সংবাদে, কামিনীর কোমল হৃদয় দয়ার্দ্র হইল। বুঁদীর অধীশ্বরী, স্বামীর অজ্ঞাতসারে, বিশ্বস্ত লোকদ্বারা, নিজ ব্যয়ে, অরণ্যস্থিত নিরাশ্রয় ইউরোপীয়দিগের নিকটে, আহার্য্য ও পরিধেয় পাঠাইতে লাগিলেন। ঐ সঙ্গে, পাদুকা প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যও প্রেরিত হইতে লাগিল। বুঁদীর অধিপতি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং শত্রুপক্ষের প্রতি, পত্নীর এই সদ্ব্যবহারের বিষয়, তাঁহার গোচর হইল না। রাজমহিষীর সাহায্যে, নিরাশ্রয় ইউরোপীয়গণ, সুস্থশরীরে, দিল্লীস্থিত ইঙ্গ্‌রেজসেনানিবাসে উপস্থিত হইল। রাণী, যথাসময়ে সাহায্য না করিলে, ইহাদের অনেকের প্রাণ নষ্ট হইত। এইরূপ সাহায্যদানে যে, আপনার প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে, তাহা রাণী জানিতেন। কিন্তু, তাহা জানিয়াও তিনি হৃদয়ের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন না। হিতৈষিণী নারী, বিপন্নের সাহায্য করিয়া, হিতৈষিতার গৌরবরক্ষা করিলেন। হায়! এই হিতৈষিতা, সদাশয়তা ও উদারতাই, রাণীর জীবননাশের কারণ হইল। বুঁদীরাজের প্রত্যাগমনের কিছু কাল পরে, রাণীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে, রাজাও, ইঙ্গ্‌রেজ সেনাপতি স্যার হিউ রোজের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। কি

কারণে, রাণীর হঠাৎ মৃত্যু হইল, তাহা ভালরূপে জানা যায় নাই। অনেকে সন্দেহ করেন, বুঁদীর অরণ্য-স্থিত অসহায় ইউরোপীয়দিগের সাহায্য করাতে, রাজার আদেশক্রমে, রাণীকে বধ করা হয়। দয়াবতী অবলা, ভূমণ্ডলে অসাধারণ পরোপকারের পরিচয় দিয়া, ঘাতকের হস্তে, আত্মজীবন সমর্পণ করেন।

উল্লিখিত ভয়ঙ্কর সময়ে,ফয়জাবাদের ডেপুটি কমিশনর, একদা কাছারিতে গিয়া শুনিলেন, নিকটবর্ত্তী সেনানিবাসের সিপাহিগণ,যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি, ঐ সংবাদ শুনিবামাত্র, একজন বিশ্বস্ত চাপরাশী দ্বারা, আপনার স্ত্রীকে, অবিলম্বে সমুদয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া, নদীর তটে যাইতে, বলিয়া পাঠাইলেন। এই চাপরাশী তাঁহার স্ত্রীর সহিত যাইতেও আদিষ্ট হইল। সহধর্ম্মিণীর নিকটে সংবাদ পাঠাইয়া, ডেপুটি কমিশনর,কার্য্যানুরোধে, সেনানিবাসে গমন করিলেন। এদিকে, কমিশনরের পত্নী, শিবিকারোহণে, বিশ্বস্ত ভৃত্যের সঙ্গে, নদীকূলে যাইতে লাগিলেন। সিপাহিগণ, এই সময়ে, সম্পত্তিলুণ্ঠন ও ইঙ্গ্রেজবিনাশের নিমিত্ত,চারিদিকে ঘূরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভীতা ও অসহায়া ইঙ্গরেজমহিলা, সন্ধ্যাসমাগমে একটি পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। একটি দয়াশীলা পল্লীবাসিনী, আপ-

নার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া, তাঁহাকে স্বীয় গৃহে আশ্রয় দিয়া, একটি অব্যবহার্য্য তুন্দুরের ভিতরে, লুকাইয়া রাখিল। এদিকে বাহকগণ, শিবিকা, নদীর তটে রাখিয়া, প্রস্থান করিল। কমিশনরের পত্নী, ভয়বিহ্বলচিত্তে, সমস্ত রাত্রি, সেই তুন্দুরের অভ্যন্তরে, লুক্কায়িত রহিলেন। রাত্রিকালে, সিপাহিরা, উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া, চারি দিকে, পলাতক ইঙ্গরেজ পুরুষ ও স্ত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, এবং পলায়িত ও আশ্রিতদিগকে বাহির করিয়া না দিলে, প্রাণসংহার করা হইবে বলিয়া, সকলকে ভয় দেখাইতে লাগিল। আপনার জীবনহানির সম্ভাবনা জানিয়াও, কোমলহৃদয়া আশ্রয়দাত্রী, নিরাশ্রয়া ইঙ্গরেজমহিলাকে উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তে, সমর্পিত করিল না। যখন ঐ ইঙ্গরেজরমণী, গ্রামমধ্যে প্রবেশ করেন, তখন গ্রামের পুরুষেরা, কৃষিক্ষেত্রের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, সুতরাং, তাহাদের অনেকে, ঐ বিষয় অবগত ছিল না। কিন্তু, গ্রামবাসিনী অধিকাংশ মহিলাই, উহা জানিত, তথাপি তাহাদের কেহই, উহা প্রকাশ করিল না। ভয়ব্যাকুলা বিদেশিনী, দরিদ্রা আশ্রয়দাত্রীর অনুগ্রহে, তুন্দুরের অভ্যন্তরে, নীরবে সমস্ত রাত্রিযাপন করিলেন। ক্রমে ভয়াবহ কোলাহল নিবৃত্ত হইল, সিপাহিগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেল। ভয়ঙ্করী রাত্রি প্রভাত হইলে, ডেপুটি

কমিশনরের পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য, সেই স্থানের অতি সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী মহারাজ মানসিংহের নিকটে যাইয়া, একখানি নৌকা প্রার্থনা করিল। দয়ার্দ্র মানসিংহ, বিপন্নের উদ্ধারার্থ, ভৃত্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ডেপুটি কমিশনেরর পত্নী ও অপর কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা, আপনাদের সন্তানবর্গের সহিত নৌকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। বাহিরে, কতিপয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সিপাহি বসিয়া রহিল, এবং এখানি তীর্থযাত্রীর নৌকা বলিয়া, সাধারণের নিকটে ভাণ করিতে লাগিল। দুই এক স্থানে ইহাদের সহিত বিদ্রোহী সিপাহিদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল; কিন্তু নৌকার অভ্যন্তরে, পলাতক ইউরোপীয় আছে, ইহা, ঐ সিপাহিগণ বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, নৌকা, কোন নিরাপদ স্থানে লাগাইয়া, কয়েক জন ভৃত্য, দুগ্ধ ও রুটির জন্য, নিকটবর্ত্তী পল্লীতে গমন করিল। এ স্থানেও, পল্লীবাসিনীগণ, বিপন্ন পলাতকদিগকে সাহায্যদানে কাতর হইল না। একটি দয়াবতী রমণী, শিশুগুলিকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া, দ্রুতগতি গ্রামে প্রবেশ করিল, এবং কয়েকটি দুগ্ধবতী ধাত্রী সঙ্গে করিয়া, নৌকার নিকটে উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ, আহ্লাদসহকারে, ইহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। ইহারা আপনাদের স্তন্যদানে, শিশুদিগকে পরিতৃপ্ত করিল।

সিপাহিগণ জানিতে পারিলে, এই আশ্রয়দাত্রী ও সাহায্যকারিণী মহিলাদিগের প্রাণসংহার করিত। আপনাদের জীবন এইরূপ সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, উক্ত দয়াবতী রমণীগণ, বিপন্নদিগের যথাসাধ্য সাহায্য করে। এইরূপ সাহায্য পাইয়া, ইউরোপীয় কুল-কামিনীগণ, নিরাপদে এলাহাবাদে উপনীত হয়।

যাহারা পরোপকারের জন্য, আত্মপ্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের সহিত কোনরূপ পার্থিব পদার্থের তুলনা হয় না। তাঁহারা, সর্ব্বদা দেবভাবে পূর্ণ হইয়া, জগতের সমক্ষে, আপনাদের অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় দেন। তাঁহাদের আবির্ভাবে, তাঁহাদের গৌরবে, তাঁহাদের অতুলনীয় কার্য্যের অনন্ত মহিমায়, এই রোগশোকময় ও দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ সংসার, সুখের, শান্তির, প্রীতির অদ্বিতীয় প্রস্রবণস্বরূপ হইয়া উঠে। ভারতের অবলাগণ, এক সময়ে পৃথিবীতে এইরূপ স্বর্গীয় ভাবের বিকাশ করিয়াছিলেন, জীবনের মমতা পরিহার করিয়া, অটল সাহস, অবিচলিত ধীরতা ও অপরিমিত দয়ার সহিত নিরাশ্রয়, বিপদগ্রস্তদিগকে, এইরূপ সুখ ও শান্তির পথে, লইয়া গিয়াছিলেন। ইঁহাদের নিঃস্বার্থ পরোপকারের সম্মান, চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

রাজভক্তির পরিচয়।

খ্রীঃ ১৫৪৩ অব্দ অতীত হইয়াছে। শের শাহের পরাক্রমে, দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুন দেশত্যাগী হইয়াছেন। যিনি, এক সময়ে মণিমুক্তায় পরিশোভিত হইয়া, দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, তিনি ভিখারী হইয়া, দেশান্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। পরপ্রদত্ত সাহায্যে, এখন তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহ হইতেছে; আপনার জন্য, প্রণয়িনীর জন্য, তনয়ের জন্য, তিনি, এখন সর্ব্বংশে, পরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর আকবরের পিতা, এক সময়ে, এইরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। আর, যিনি ক্ষমতাবলে কাবুলের পার্ব্বত্য প্রদেশে, আর্য্যাবর্ত্তের পবিত্র ভূমিতে, দক্ষিণাপথের প্রশস্ত ক্ষেত্রে, বিজয়পতাকাস্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি, বিস্তীর্ণ ভারতমরুর এক খণ্ড ওয়েশিসের সামান্য গৃহে, জন্মগ্রহণ করিয়া, পরকীয় সাহায্যে, সামান্যভাবে, কালাতিপাত করিতেছিলেন।

শের শাহ, দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। দিল্লীর পতাকা, এখন, মোগলবংশের পরিবর্ত্তে, শূরবংশের গৌরব প্রকাশ করিতেছে। আমীর ওমারহগণ, এখন, মোগলের পরিবর্ত্তে শূর-

বংশীয়ের আদেশপ্রতিপালন জন্য, ব্যস্ত রহিয়াছেন। শের শাহ, হুমায়ুনকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু, ভারতের সকল স্থানে, আধিপত্যস্থাপন করিতে পারেন নাই। দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, তিনি, রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্কল্প করিলেন। বীরভূমি রাজপুতনা, তাঁহার লক্ষ্য হইল। শের শাহ, আশী হাজার সৈন্য লইয়া, মাড়বার আক্রমণ করিলেন।

মাড়বার, প্রকৃতির কমনীয় শোভায় অলঙ্কৃত নহে। মনোহর বৃক্ষলতা বা শস্যসমাকীর্ণ শ্যামল ভূখণ্ডে, উহার সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। বিস্তীর্ণ বালুকাসাগর, নিরন্তর, মাড়বারের ভীষণতার পরিচয় দিতেছে। উপস্থিত সময়ে, পরাক্রান্ত রাঠোরগণ, এই মরুস্থলীর গৌরবরক্ষা করিতেছিলেন। শের শাহ, এই গৌরবহরণে উদ্যত হইলেন। আশী হাজার সৈনিক পুরুষ, বিপুলবিক্রমে, মাড়বারের অভিমুখে আসিতে লাগিল। সংবাদ, মরুস্থলীতে প্রচারিত হইল। রাঠোরগণ, যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে, বহুসংখ্য সৈন্য সমবেত হইল। দেখিতে দেখিতে, মরুস্থলীর অধিপতি মহারাজ মালদেব, পঞ্চাশ হাজার তেজস্বী রাঠোরের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া, দিল্লীর অভিনব সম্রাটের গতিরোধার্থ, দণ্ডায়মান হইলেন।

বীরভূমির বীরত্বের গৌরব অক্ষুণ্ণ হইল। পঞ্চাশ হাজার রাঠোরের পরাক্রমে, দিল্লীর আশী হাজার সৈন্যের গতিরোধ হইল। হুমায়ুনের বিজেতা, মরুস্থলীর বীরগণের বীরত্বের নিকটে, মস্তক অবনত করিলেন। মালদেবের ব্যূহভেদ করা, অসাধ্য দেখিয়া, শের শাহ, প্রতিনিবৃত্তি হইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু, রাঠোর সৈন্যের বিক্রমে, তাহাও ব্যর্থ হইল। চতুর সম্রাট, অতঃপর চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শের শাহ, আপনার নামে একখানি পত্র লিখিলেন। বিশেষ কৌশলের সহিত পত্রে, মালদেবের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণের নাম জাল করা হইল, যেন সর্দ্দার-গণ শের শাহকে লিখিতেছেন, তাঁহারা, মাল-দেবের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। যুদ্ধের সময়, সকলেই, আপন আপন সৈন্যদল লইয়া, দিল্লীর সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইবেন। চতুর সম্রাটের কৌশলে, পত্র, মালদেবের হস্তগত হইল। পত্র পাইয়া, মালদেব, স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইলেন, আপনার সর্দ্দারদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া, মনে করিতে লাগিলেন। চতুরের চাতুরী, ফলবতী হইল। মালদেব, আপনার সর্দ্দারগণ হইতে, বিচ্ছিন্ন হইবার উদ্‌যোগ করিলেন। এই আকস্মিক ব্যাপারে, তেজস্বী রাঠোর সর্দ্দার কুম্ভের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। কুম্ভ,

মালদেবকে অনেক বুঝাইলেন, সনাতন ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া, আপনাদের বিশ্বস্ততা সপ্রমাণ করিতে লাগিলেন, দুরন্ত বিপক্ষের চাতুরীর কথা কহিয়া, পবিত্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্মরক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু, মালদেব কিছুই শুনিলেন না, কিছুই বুঝিলেন না। তাঁহার হৃদয়, ঘোর অন্ধকারময় হইয়াছিল, কুম্ভের চেষ্টায়, উহা, আর আলোকিত হইল না। কুম্ভ, নীরব হইলেন। তাঁহার ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত হইল। জ্যোতির্ম্ময় নেত্রদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তেজস্বী ক্ষত্রিয় বীর, মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন, এবং মুহূর্ত্তকালের মধ্যে, আপনাদের সৈন্যদল লইয়া, বিপক্ষ সৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কুম্ভ, দশ হাজার মাত্র সৈন্য লইয়া,অমিতপরাক্রমে, শের শাহের আশী হাজার সৈন্যের উপর পতিত হইলেন। তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ে, কিছু মাত্র ভয়ের বিকাশ নাই, উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে, কিছু মাত্র কালিমার সঞ্চার নাই। বিপক্ষ, তাঁহাদের পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়াছে, পবিত্র বীরধর্ম্মের অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কুম্ভ অরাতির শোণিতে, সেই কলঙ্করেখা প্রক্ষালিত করিতে উদ্যত, পবিত্র সমরে, আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া, বীরত্বকীর্ত্তি উজ্জ্বলতর করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তুমুল সংগ্রামে,

কুম্ভ, আপনার লোকাতীত তেজস্বিতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। বিপক্ষগণ, এ তেজস্বিতার গতি-নিরোধ করিতে পারিল না। তাহাদের অনেকে, সমরক্ষেত্রে চিরনিদ্রিত হইতে লাগিল। অনেকে, শক্রর আক্রমণ হইতে, আপনাদের প্রাণরক্ষার জন্য, ব্যস্ত হইল। শের শাহ, হতাশ হইলেন, চারি দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। রাঠোরগণের পরাক্রমে তাঁহার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইল। ইহার মধ্যে, আর এক দল সৈন্য, তাঁহার সাহায্যার্থ আসিল। কুম্ভ, অবিশ্রান্ত, শক্রসেনানাশ করিতে করিতে, পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, এমন সময়ে, অভিনব সৈন্যদল, তাহাকে আক্রমণ করিল। পরাক্রান্ত রাঠোর বীর, ঐ আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু রণে ভঙ্গ দিয়া, ভীরুতার পরিচয় দিলেন না। তিনি, আপনাদের বিশ্বস্ততা দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, এখন তুচ্ছ প্রাণের জন্য, ঐ প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইলেন না। মরুস্থলীর পুণ্য ক্ষেত্রে—শক্রর কোলাহলমধ্যে, তেজস্বী বীরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। কুম্ভ, অকাতরে যুদ্ধ করিতে করিতে, প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাঠোরের বীরত্বে, শের শাহ চমকিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে, তিনি মাড়বারের অনুর্ব্বরতা

লক্ষ্য করিয়া, ভীতিব্যঞ্জক স্বরে কহিয়াছিলেন, "আমি একমুষ্টি ভুটার জন্য, এখনই ভারতসাম্রাজ্য হারাইতে-ছিলাম।"

প্রভুভক্তির পরিচয়।

খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ অতীত হইয়াছে। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব, আর্য্যাবর্ত্তের পর দক্ষিণা-পথে, আপনার প্রভুত্ববিস্তারের চেষ্টা পাইতেছেন। শিবজী, বীরত্বের গৌরবে, তেজস্বিতার মহিমায়, আপনার রাজ্যরক্ষা করিতেছেন। ক্ষমতাশালী মোগল, কিছুতেই তাঁহার বীরত্বকীর্ত্তি সঙ্কুচিত করিতে পারিতেছেন না। দিনের পর দিন, অতীত হই-তেছে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, অতি-বাহিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু শিবজীর প্রতাপ মন্দী-ভূত হইতেছে না। অতঃপর সম্রাট আওরঙ্গজেব, শিব-জীকে বশীভূত করিবার জন্য, আপনার মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দক্ষিণাপথের সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। যাহাতে, শীঘ্র শীঘ্র শিবজী বশীভূত হন, তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার দুর্গ সকল অধিকারভুক্ত হয়, তদ্বিষয়ে,

বিশেষ মনোযোগ দিবার জন্য, নবনিয়োজিত সুবা-দারের উপর আদেশ হইল। সম্রাটের আদেশে, শায়েস্তা খাঁ, বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া, আওরঙ্গবাদ হইতে পুনার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পুনা অধিকৃত হইল। শিবজী, মোগলসৈন্যের আগমন-সংবাদ পাইয়া, রায়গড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহগড়ে আসিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। এ দিকে, শায়েস্তা খাঁ, পুনা হস্তগত করিয়া, এক দল পরাক্রান্ত সৈন্য, ঘাট-পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি স্থান, অধিকার করিতে, পাঠাইলেন। তিনি, শিবজীর অধিকৃত জনপদে, মোগলের জয়পতাকাস্থাপনে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত তাঁহার তেজস্বিতা বিকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু, তেজস্বী সুবাদার, বিনাবাধায়, মহা-রাষ্ট্র রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। শিবজীর শিক্ষায়, মহারাষ্ট্রীয়গণ সাহস ও বলসম্পন্ন হইয়াছিল। মোগল সুবাদার, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও, এই পরা-ক্রান্ত জাতিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারাষ্ট্রে চকননামে একটি ক্ষুদ্র জনপদ ছিল। শিবজী, ফিরঙ্গজীনামক এক জন সেনানায়কের হস্তে, ঐ জনপদের রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। তেজস্বী ফিরঙ্গজী, সতর বৎসর, চকনরক্ষা করিয়া, আসিতেছিলেন। শায়েস্তা খা, চকনের আয়তন অতি

ক্ষুদ্র দেখিয়া, ভাবিয়াছিলেন, তিনি আদেশ করিবা মাত্র, ঐ নগরের শাসনকর্ত্তা, তাঁহার হস্তে, আত্মসমর্পণ করিবেন। কিন্তু, ফিরঙ্গজী ক্ষুদ্র জনপদের রক্ষক হইলেও, ক্ষমতা ও তেজস্বিতায় ক্ষুদ্র ছিলেন না। তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন না। তাঁহার সাহস বাড়িয়া উঠিল, পরাক্রম প্রবল হইল। বীরপ্রবর, বীরত্বের সহিত তেজস্বী মোগলসৈন্যের সম্মুখে, আত্মরক্ষায় উদ্যত হইলেন। ক্রমে, এক মাস গেল, আর এক মাসেরও অর্দ্ধাংশ অতীত হইল, তথাপি পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়, মোগলের পদানত হইলেন না। দিনের পর দিন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ, যাইতে লাগিল, প্রতিদিনে, প্রতি-সপ্তাহে, ফিরঙ্গজী, নবীন সাহস, নবীন উদ্যম, নবীন বীরত্বসহকারে, আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে, এক মাস, পঁচিশ দিন কাটিয়া গেল। চকন, শায়েস্তা খাঁর অধিকৃত হইল না। ষড়্‌বিংশ দিবসে, হঠাৎ, নগরপ্রাচীরের এক দিকে, একটি কুল্যা ফুটিয়া উঠাতে, প্রাচীরের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গেল। আক্রমণ-কারী মোগল সৈন্য, মহোল্লাসে ঐ ভগ্ন স্থান দিয়া, নগরপ্রবেশে উন্মুখ হইল। এই সঙ্কটকালে, সাহসী ফিরঙ্গজী, আপনার সৈন্যগণের অগ্রভাগে থাকিয়া, বিপক্ষের গতিরোধে উদ্যত হইলেন। তাঁহার পরাক্রম, তাঁহার ক্ষমতা, তাঁহার বীরত্ব, কিছুতেই পর্য্যুদস্ত

হইল না। ফিরঙ্গজী, এমন কৌশলে, এমন তেজস্বিতার সহিত বিপক্ষের আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন যে, আক্রমণকারী সৈন্যদল কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিল না। তিনি, সমস্ত দিন, এইরূপে, আত্মরক্ষা করিলেন, এইরূপে, সমস্ত দিন, নগরপ্রাচীরের ভগ্ন স্থানে দাঁড়াইয়া, বহুসংখ্য মোগলসৈন্যের অধিনায়ক শায়েস্তা খাঁর সম্মুখে, বীরত্বের গৌরবরক্ষা করিলেন। ক্রমে রাত্রি আসিল, রাত্রিসমাগমে, মোগলসৈন্য যুদ্ধে নিরস্ত হইল। পর দিন প্রাতঃকালে, তেজস্বী ফিরঙ্গজী, শায়েস্তা খাঁর সম্মুখেই উপস্থিত হইলেন। শায়েস্তা খাঁ, এই বীরপুরুষের সমুচিত মর্য্যাদা করিতে ত্রুটি করিলেন না। তিনি, ফিরঙ্গজীর অসাধারণ সাহস ও ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে কহিলেন, যদি তিনি মোগলসরকারে চাকরী গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে অনেক পুরস্কার দেওয়া যাইবে। কিন্তু, তেজস্বী ফিরঙ্গজী, প্রভুভক্তির অবমাননা করিলেন না। তিনি, শায়েস্তা খাঁর অনুরোধরক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। শায়েস্তা খাঁ, তাঁহার প্রভুভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ফিরঙ্গজী, শিবজীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, শিবজী, তাঁহার প্রভুভক্তি, সাহস ও ক্ষমতার পুরস্কার করিতে, ত্রুটি করেন নাই।

প্রতিজ্ঞাপালন।

মোগলসম্রাট আকবরের মৃত্যু হইয়াছে। কুমার সলিম, জাহাঁগীর নাম পরিগ্রহ করিয়া, দিল্লীর রত্ন-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। জাহাঁগীর, ভারতের চারি দিকে,আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে, চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহার পিতা, যে বিজয়িনী শক্তিতে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, জাহাঁগীর সে শক্তিসংগ্রহ করিতে যত্নশীল হইয়াছেন। পরাক্রান্ত রাজপুতরাজ্য, আকবরের প্রধান লক্ষ্য ছিল। মিবারের প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ, আপনার বীরত্ব ও সহিষ্ণুতাবলে, দীর্ঘকাল, মোগলসৈন্যের সমক্ষে, আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। জাহাঁগীর,প্রতাপের ঐ বীরত্ব ও তেজস্বিতার বিষয় বিস্মৃত হন নাই। এখন স্বয়ং রাজেশ্বর হইয়া, মিবার, অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। দিল্লীর অভিনব সম্রাট, চিতোরের প্রাচীন দুর্গ হস্তগত করিলেন। চিতোরের অধিপতি, দুর্গম পর্ব্বতের বিজন অরণ্যে যাইয়া, আত্মরক্ষা করিতে, বাধ্য হইলেন। রাজ্যের সীমান্তভাগে, অন্তল নামে, একটি দুর্গ ছিল। ঐ দুর্গেও, সম্রাটের আধিপত্য স্থাপিত হইল। কিন্তু, পরাক্রান্ত রাজপুতগণ, ইহাতে উদ্যমশূন্য হইল না। চিতোরের অধিপতি, দুর্গ হস্তগত করিতে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

হইলেন, রাজপুতনার বীরত্বদৃপ্ত রাজপুতগণ, আপনাদের প্রনষ্ট গৌরবের উদ্ধারবাসনায়,আত্মজীবন উৎসর্গ করিলেন। এই সময়ে, রাজপুতনার বীরপুরুষগণ, অসাধারণ তেজস্বিতার সহিত আপনাদের প্রতিজ্ঞাপালন করেন।

রাজপুতনার বীরগণ, দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে একত্র হইয়াছেন ; মিবারের রাণা, পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাভূত করিবার জন্য, এই বীরগণের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। এই সময়ে, সকলেই আপনাদের বীরত্বগৌরব দেখাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁহাদের রাজ্যে,শত্রুগণ প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহাদের দুর্গে, শত্রুর পতাকা উড়িতেছে, তাঁহারা শত্রুর আক্রমণে, পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, এখন সকলেই, এই শত্রুকে সমুচিত প্রতিফল দিতে যত্নশীল। বীরভূমির সাহসসম্পন্ন চন্দাবত ও শক্তাবতগণ* একত্র হইয়াছেন। সকলেই, আপনাদের পূর্ব্বপুরুষোচিত তেজস্বিতা দেখাইতে অগ্রসর। চন্দাবতগণ, যুদ্ধযাত্রী সৈন্যগণের অগ্রগামী হইতে, আগ্রহপ্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তাবতগণও, ঐ সম্মান পাইবার জন্য, লালায়িত হইয়াছেন। এখন উভয়েই, উভয়ের অগ্রে

* চিতোরের একজন প্রাচীন রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম চন্দ। ইহার দলস্থগণ চন্দাবত নামে প্রসিদ্ধ। শক্ত, রাণা উদয়সিংহের পুত্র। এই নামে, শক্তাবতদল প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

খাইয়া, আত্মপ্রাধান্য দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। উভয় দলই, আপনাদের তরবারির উপর নির্ভর করিয়া, উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করিতে, ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু, রাণা, কৌশলক্রমে এই আত্মবিগ্রহের রোধ করিলেন। তিনি, ধীরভাবে কহিলেন, "যিনি, শত্রুর অধিকৃত অন্তল দুর্গে, অগ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন, তাঁহারই, সৈন্যদলের অগ্রে যাইবার সম্মানলাভ হইবে।" চন্দাবত ও শক্তাবতগণ, রাণার আদেশে, ঐ গৌরবান্বিত সম্মানলাভের জন্য, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, বিপুল উৎসাহসহকারে, অন্তল দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অন্তল, মিবারের একটি দুর্গ। উহা, রাজ্যের সীমান্তভাগে অবস্থিত, এবং রাজধানী হইতে প্রায় আঠার মাইল দূরবর্ত্তী। দুর্গটি উন্নত ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত। একটি স্রোতস্বতী, উহার প্রাচীরের পাদদেশ দিয়া, প্রবাহিত হইতেছে। প্রাচীর অতি দৃঢ় ও উন্নত। দুর্গে যাইবার জন্য, কেবল একটি মাত্র পথ। ঐ পথ, দুর্গের লোহকীলকময় সুদৃঢ় সিংহদ্বারে অবরুদ্ধ রহিয়াছে।

চন্দাবত ও শক্তাবতগণ, গভীর নিশীথের শান্তিভঙ্গ না হইতেই, আপনাদের প্রতিজ্ঞাপালন জন্য, ঐ দুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চারণগণ, মধুরকণ্ঠে, তেজস্বিতার উদ্দীপক সঙ্গীতে, উভয় দলের উৎসাহবৃদ্ধি

করিতে লাগিল। উভয় দল, এই সঙ্গীতে উৎসাহযুক্ত হইয়া, বীরদর্পে, বিভিন্নপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রভাতসময়ে, শক্তাবতগণ, দুর্গদ্বারের নিকটে উপনীত হইলেন। এই সময়ে, শত্রুগণ নিরস্ত্র ছিল, কিন্তু, তাহারা, আক্রমণসংবাদ পাইয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, দুর্গপ্রাচীরে দাঁড়াইল। রাজপুতগণ, প্রবলবেগে, দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মোগল সৈন্যও, দৃঢ়তার সহিত এই আক্রমণে বাধা দিতে লাগিল। এদিকে, চন্দাবতগণ জলাভূমি পার হইয়া, দুর্গের অভিমুখে আসিতেছিলেন। দুর্গের প্রাচীরে উঠিবার আশায়, তাঁহারা, কতকগুলি মই, সঙ্গে আনিয়াছিলেন। শক্তাবতদলের অধিনায়ক, ইহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সঙ্গে মই ছিল না, সুতরাং, তিনি, দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের অগ্রেই, দুর্গে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। এদিকে, কামানের গোলার আঘাতে, চন্দাবতদলের অধিনায়ক পড়িয়া গেলেন। মোগল সৈন্য, উভয় দলকেই, সমান ভাবে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু, শক্তাবতদিগের তেজস্বী অধিনায়ক নিরস্ত হইলেন না। তিনি, যে হস্তীতে ছিলেন, সেই হস্তী দ্বারা, দুর্গদ্বার ভাঙ্গিতে, চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ দ্বার, সুতীক্ষ্ণ লৌহময় শলাকায় পরিব্যাপ্ত ছিল, সুতরাং, হস্তী আপনার বলপ্রকাশের সুবিধা পাইল

না। সাহসী শক্তাবত, ইহা দেখিয়া, হাওদা হইতে নামিলেন, এবং ধীরপ্রশান্তভাবে, সেই তীক্ষ্ণ লৌহ-শলাকাময় দ্বারে, বক্ষঃস্থল পাতিয়া, মাহুতকে আপনার পৃষ্ঠদেশে, হাতী চালাইতে কহিলেন। মাহুত, অধিনায়কের আদেশ প্রতিপালন করিল। হস্তী, তেজস্বী শক্তাবতের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া, দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া দিল। বীরপুরুষ, প্রতিজ্ঞাপালন জন্য, ধীরভাবে লৌহ-শলাকায় বুক পাতিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

শক্তাবতগণ, আপনাদের অধিনায়কের ঐ লোকাতীত তেজস্বিতাতেও, অভীষ্ট সম্মানলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা, অধিনায়কের মৃতদেহের উপর দিয়া, দুর্গদ্বারে আসিয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে, চন্দাবতদলের অধিনায়ক নিহত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আর একটি সাহসী ব্যক্তি, এই দলের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি, নিহত অধিনায়কের দেহ, পৃষ্ঠদেশে বাঁধিয়া, বিপুল বিক্রমে, অগ্রসর হইলেন, এবং হস্তস্থিত শাণিত অস্ত্র দ্বারা, আপনার পথ মুক্ত করিয়া, পৃষ্ঠস্থিত অধিনায়কের মৃত দেহ, দুর্গের মধ্যে ফেলিয়া, ভৈরব রবে কহিলেন, "চন্দাবত, অগ্রে, অন্তল দুর্গে প্রবেশপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাপালন করিলেন, সুতরাং, তিনিই, যুদ্ধযাত্রী সৈন্য-দলের অগ্রণী।"

অসাধারণ সাহস।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের শ্রাবণ মাস। মহারাও কিশোরী সিংহ, কোটার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। নগরের চারিদিকে অবিচ্ছেদে, আমোদের স্রোত বহিতেছে। হস্তী, ঘোটক প্রভৃতি, নানাবেশে সজ্জিত হইয়া, রাজসভার এক দেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অশ্বারোহী সৈন্যগণ, যুদ্ধবেশ পরিগ্রহ করিয়া, বীরত্ব-গৌরবের পরিচয় দিতেছে। মহারাও কিশোরী সিংহ, সুসজ্জিত সভাতলে, রত্নমণ্ডিত সিংহাসনে বসিয়া, গবর্ণর জেনেরলের প্রতিনিধির সমক্ষে, রাজধর্ম্মের প্রতিপালনে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। হরকুলসম্ভূত বীর্য্যবন্ত রাজপুতদিগের জয়ধ্বনিতে হরবতী পরিপূর্ণ হইয়াছে।

এই আমোদ দীর্ঘকাল থাকিল না। যে প্রীতির উচ্ছ্বাসে, কোটার অধিবাসিগণ, আপনাদের অভিনব রাজার প্রতি আদর দেখাইয়াছিল, সে প্রীতি, কোটায় দীর্ঘকাল শান্তিসুখ অব্যাহত রাখিতে পারিল না। কিছুকাল পরে, রাজ্যে নিদারুণ অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কোটার প্রধান সচিব জলিম সিংহের সহিত কিশোরী সিংহের বিরোধ ঘটিল। জলিম সিংহ, কিশোরী সিংহের পিতা উমেদ সিংহের

অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন। রাজ্যশাসনের অনেক ভার, তাঁহার হস্তে সমর্পিত ছিল। এখন, এই বর্ষীয়ান্ অমাত্য ও মহারাও কিশোরী সিংহের মধ্যে, অসদ্ভাব জন্মিল। পূর্ব্বতন প্রীতি ও একতার স্থলে, দুর্নিবার বিদ্বেষ ও অনৈক্য, স্থানপরিগ্রহ করিল। এখন, উভয়েই, উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া, যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলেন। গুরুতর আত্মবিগ্রহে, হরবতী বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল।

একদা, প্রভাতসময়ে, জলিমসিংহের সৈন্য, একটি ক্ষুদ্র নদীর তটদেশ দিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাওর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে। তটভূমি অতি উচ্চ, উন্নত পর্ব্বতের ন্যায় লম্বভাবে, আকাশের দিকে উঠিয়াছে। ঐ উন্নত তটভূমি দিয়া, প্রায় আট হাজার সৈন্য, কুড়িটি কামান লইয়া, ধীরে ধীরে যাইতেছে। অকস্মাৎ ইহাদের গতিরোধ হইল। নদীর তটভূমির অদূরবর্ত্তী প্রান্তরের একটি উন্নত মৃত্তিকাস্তূপ হইতে, গুলির পর গুলি আসিয়া,অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলে পতিত হইতে লাগিল। গুলিবৃষ্টির বিরাম নাই। অবিরাম, গুলি আসিয়া, অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলের অনেককে আহত করিল, অনেককে, সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উন্নত তটভূমিতে, চিরনিদ্রিত করিয়া রাখিল। সৈন্যদল, মৃত্তিকাস্তূপের দিকে চাহিয়া দেখিল, দুইটি বীরপুরুষের বিক্রমে, তাহাদের

গতিরোধ হইয়াছে। বীরদ্বয়ের একটি, মৃত্তিকাস্তূপের পশ্চাতে থাকিয়া, বন্দুকে গুলি ভরিয়া দিতেছে, অপরটি অব্যর্থসন্ধানে, গুলিবৃষ্টি করিয়া, অরাতিপক্ষনিপাত করিতেছে। এক দিকে, আট হাজার সৈন্য ও কুড়িটি কামান, অপর দিকে, কেবল দুইটি মাত্র বীরপুরুষ। বীরযুগলের পরাক্রমে, এতগুলি সৈন্যের গতিরোধ হইয়াছে। এই বীরযুগল, মহারাও কিশোরী সিংহের প্রভুভক্ত সৈন্য, হরবতীর হরকুলসম্ভূত বীর্য্যবন্ত ক্ষত্রিয়। এই প্রভুভক্ত ক্ষত্রিয়বীরদ্বয়, অপনাদের প্রভু-ভক্তির নিদর্শন দেখাইতে, বহুসংখ্য সৈন্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া,অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিতেছে।

বীরযুগলের তেজস্বিতার গতিবোধে অসমর্থ হইয়া, বিপক্ষগণ, তাহাদের সম্মুখে, দুইটি কামান স্থাপিত করিল। কামানের ধ্বনি শুনিবামাত্র, বীরদ্বয়, সেই উন্নত মৃত্তিকাস্তূপের শিখরদেশে দাঁড়াইয়া,অসম সাহসে, গম্ভীরভাবে, বিপক্ষদিগকে অভিবাদন করিল। বিপক্ষ সৈন্যদল হইতে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। গোলার আঘাতে, বীরযুগলের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিল। সাহসী ক্ষত্রিয়দ্বয় আহত হইয়াও, শত্রুসংহারে নিরস্ত থাকিল না। যদিও, ইহাদের আক্রমণে, বিপক্ষদল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তথাপি, সেই সৈন্যদলের অধিনায়কগণ, অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসের জন্য,

ইহাদিগকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। অবিলম্বে, গোলাবৃষ্টি বন্ধ করিতে, আদেশ দেওয়া হইল। সৈন্য-দল, আদেশপালন করিয়া, ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। সৈন্যদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, দুইটি মাত্র সৈনিকপুরুষ, আক্রমণকারী বীরদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে। এই আদেশ শুনিবামাত্র, দুই জন তরুণবয়স্ক রোহিলা অগ্রসর হইল। বীরযুগল, গোলার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। অবিরত শোণিতস্রাবে, তাহাদের শক্তি ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা, এই আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া, সেই উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপরে, উভয়ে পড়িয়া গেল। আর তাহাদের চেতনার সঞ্চার হইল না। সাহসী বীরদ্বয়, ধীরভাবে আত্মবসর্জ্জন করিয়া, অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিল।
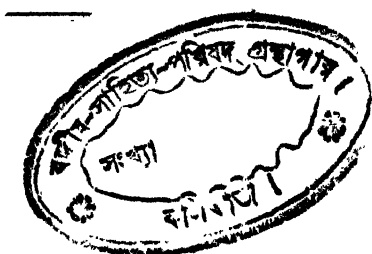
বীরত্ব ও তেজস্বিতা।

ভারতের মানচিত্রের দক্ষিণপশ্চিম অংশে,শৈলমালা-পরিবৃত একটি প্রদেশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐ প্রদেশের উত্তরে,সাতপুরা পাহাড় গম্ভীরভাবে অবস্থিতি করিতেছে, পশ্চিমে, বিশাল সমুদ্র, তরঙ্গলীলা বিস্তার করিয়া, অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে, পূর্ব্বে, বরদা নদী বহিয়া যাইতেছে, এবং দক্ষিণে, গোয়া নগর ও অসমতল পার্ব্বত্য ভূভাগ অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ প্রদেশ মহারাষ্ট্রনামে পরিচিত। উহার পরিমাণফল ১০২,০০০ বর্গমাইল। মহারাষ্ট্রদেশ, মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। উহার অভ্যন্তরে, দুরারোহ সহ্যাদ্রি, উত্তরে দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে। হরিদ্বর্ণ বৃক্ষশ্রেণীতে, গিরিবরের অধিকাংশ শোভিত। এই সৌন্দর্য্যপূর্ণ ভূখণ্ডে, একটি তেজস্বী বীরপুরুষের জন্ম হয়। ইঁহার নাম শিবজী।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে, দক্ষিণাপথের অনেক স্থলে, মুসলমানদিগের আধিপত্য ছিল। বিজয়পুরের মুসলমান রাজারা বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। শাহজী নামে এক জন মহারাষ্ট্রবাসী ব্রাহ্মণযুবক, বিজয়পুরের রাজসরকারে চাকরী করিতেন। ক্রমে, বিষয়কর্ম্মে, শাহজীর ক্ষমতা পরিস্ফুট হয়, ক্রমে, শাহজী, বিজয়-

পুরের অধিপতির গণনীয় কর্ম্মচারীর শ্রেণীভুক্ত হইয়া, উঠেন। শাহজী, জিজিবাইনামে একটি মহারাষ্ট্র-রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। জিজিবাইয়ের গর্ভে শাহজীর দুইটি পুত্রসন্তান জন্মে ; প্রথমের নাম শম্ভুজী, দ্বিতীয়ের নাম শিবজী।

শিবজী, ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে, মে মাসে, পূনার পঞ্চাশ মাইল উত্তরে, শিউনেরী দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি, পিতার তাদৃশ স্নেহের পাত্র ছিলেন না। শাহজী, শিবজী অপেক্ষা, শম্ভুজীকেই অধিক ভাল বাসিতেন। এজন্য, তিনি, শম্ভুজীকে আপনার নিকটে রাখেন। শিবজী, মাতার সহিত থাকেন। শিবজীর জন্মগ্রহণের তিন বৎসর পরে, শাহজী, টুকাবাই নামে আর একটি মহারাষ্ট্ররমণীকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করাতে, জিজিবাইয়ের সহিত শাহজীর বিরোধ উপস্থিত হয়। এজন্য, শিবজী, প্রায় ছয় বৎসর, পিতার দেখা পান নাই। যাহা হউক, শাহজী, দাদাজী কর্ণদেবনামক এক ব্যক্তিকে, শিবজী ও তদীয় মাতার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পূনার জাইগীরের তত্ত্বাবধান জন্য, নিযুক্ত করেন। দাদাজী, সাতিশয় ক্ষমতাপন্ন ও রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি, জিজিবাইয়ের জন্য, পূনাতে একটি বৃহৎ বাড়ী নির্ম্মিত করিয়া দেন। পূনার ঐ নূতন বাড়ীতে, দাদাজী

কর্ণদেবের, তত্ত্বাবধানে।শিবজীর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

এই সময়ে, মহারাষ্ট্রবাসীরা কদাচিৎ লেখাপড়া শিখিত। লেখাপড়াশিক্ষা অপেক্ষা, বীরোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত হইতেই, তাহাদের বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল। শিবজী, নিজের নাম লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু, তিনি তীরনিক্ষেপে, তরবারিপ্রয়োগে, বড়শাসঞ্চালনে, বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার স্বদেশীয়গণ, সুনিপুণ অশ্বারোহী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শিবজী, এ বিষয়ে, স্বদেশের সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বচালনাকৌশল দেখিয়া, দর্শকগণ, অপরিসীম বিস্ময় ও প্রীতির সহিত, তাঁহার গুণগান করিত। দাদাজী, শিবজীকে, আপনাদের ধর্ম্মানুগত বিষয়ে আস্থাযুক্ত করিতে, প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রয়াস, সর্ব্বাংশে সফল হইয়াছিল। শিবজী, হিন্দুধর্ম্মসম্মত কার্য্যে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। তিনি, মনোযোগের সহিত হিন্দুধর্ম্মের কথা শুনিতেন। রামায়ণ,মহাভারত ও ভাগবতের আখ্যায়িকায়, তাঁহার বিশেষ সুখানুভব হইত। বাল্যকাল হইতে, কথকতার উপর, তাঁহার এমন শ্রদ্ধা ছিল যে, যেখানে কথকতা হইত, তিনি নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া, সেইখানে উপস্থিত হইতেন। হিন্দু-

ধর্ম্মের উপর, এইরূপ অচলা ভক্তি ও হিন্দুধর্ম্মসম্মত কার্য্যে, এইরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকাতে, মহাবীর শিবজী, হিন্দু নামের গৌরবরক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। শত্রুর ভ্রূকুটিপাতে, বিপদের ঘোরতর অভিঘাতে, তিনি এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হন নাই। শিবজী, অবিচলিতচিত্তে এই প্রতিজ্ঞারক্ষা করিয়াছিলেন।

ষোল বৎসর বয়সে, শিবজী এমন তেজস্বী ও সাহসী হইয়া উঠিলেন যে, দাদাজীর শাসন অতিক্রম করিয়াও, অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষদিগের সহিত, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে, স্বদেশের দুর্গম পার্ব্বত্য পথগুলি, তাঁহার পরিচিত হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রে, অনেকগুলি গিরিদুর্গ ছিল। শিবজী, কৌশলক্রমে, ঐ গিরিদুর্গের অনেকগুলিতে, আধিপত্যস্থাপন করিলেন। দুর্গগুলি, বিজয়পুরের অধিপতির অধিকৃত ছিল। শিবজী, উহা অধিকার করাতে, বিজয়পুরের রাজার সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। আফজল্‌খাঁ, বিজয়পুরের সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। শিবজী, এই সময়ে, প্রতাপগড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি, এই স্থানে থাকিয়া, আফজল্‌খাঁকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার, এই সঙ্কল্পসিদ্ধির কোন ব্যাঘাত হইল না।

শিবজী, বিজয়পুরের সৈন্যের সম্মুখে, প্রাধান্যস্থাপন করিতে, কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। তিনি, আফজল্‌খাঁকে জানাইলেন, বিজয়পুরের অধিপতির ন্যায় ক্ষমতাশালী লোকের বিরুদ্ধাচরণ করিতে,তাঁহার কোনও ইচ্ছা নাই। তিনি, আপনার ব্যবহারে, অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। যদি, আফজল্‌খাঁ, দয়া করিয়া, তাঁহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে, তিনি, নিজের অধিকৃত প্রদেশ, তাঁহার হস্তে সমর্পিত করিতে প্রস্তুত আছেন।

শিবজীর এইরূপ অবনতিস্বীকারের কথায়, আফজল্‌খাঁ সন্তুষ্ট হইলেন। জঙ্গলময় দুর্গম গিরিপ্রদেশে সৈন্য লইয়া, অগ্রসরহওয়া যে, কত দূর কষ্টকর, তাহা, তিনি অবগত ছিলেন। এখন শিবজী, আপনা হইতেই, তাঁহার অনুগত হইবেন, ইহা ভাবিয়া, আফজল্‌খাঁ, নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি, কালবিলম্ব না করিয়া, পন্তজী গোপীনাথনামক এক জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে, প্রতাপগড়ে, শিবজীর নিকটে, পাঠাইয়া দিলেন। দূত, দুর্গের নিম্নস্থিত গ্রামে উপস্থিত হইলে, শিবজী, দুর্গ হইতে নামিয়া,তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পন্তজী, ধীরতার সহিত শিবজীকে কহিলেন, "শাহজীর সহিত আফজল্ খাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব আছে। আফজল, বন্ধুর পুত্রের, কোনও অপকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি,

শক্রুতা না করিয়া, একটি জায়গীরের আধিপত্য, আপনাকে দিতে প্রস্তুত আছেন।” শিবজী, বিশেষ সৌজন্য ও বিনয়ের সহিত আফজল খাঁর প্রেরিত দূতকে বলিলেন, “একটি জায়গীর পাইলেই, আমি সন্তুষ্ট হইব; আমি, বিজয়পুরভূপতির এক জন সামান্য ভৃত্যমাত্র।” দূত, শিবজীর এইরূপ শীলতা ও নম্রতা দেখিয়া, সন্তোষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, শিবজী, দূতের আবাস জন্য, যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু, তাঁহার আদেশে, দূতের সহচরগণ, কিছু দূরে, অন্য স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। একদা, গভীর নিশীথে, শিবজী, পন্তজী গোপীনাথের নিকটে উপস্থিত হইয়া, আপনার পরিচয় দিয়া, কহিলেন, “আমি হিন্দুজাতির পরিশুদ্ধ বিশ্বাস ও পবিত্র ভক্তির সম্মানরক্ষার জন্য, সমস্ত কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণ, সুতরাং, আপনার সাহায্যকরা, আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার আশা আছে, সজাতি ব্রাহ্মণের সহিত, আমি, পরম সুখে, কালাতিপাত করিতে পারিব।” শিবজী, গম্ভীরভাবে ইহা কহিয়া, পন্তজীকে একখানি গ্রাম, ইনাম দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পন্তজী, এই তরুণবয়স্ক বীরের অসীম সাহস দেখিয়া, মুগ্ধ হইলেন। আর, তাঁহার মুখ হইতে, শিবজীর বিরুদ্ধে কোনও

কথা বাহির হইল না। তিনি, ধীরভাবে শিবজীর কার্য্যসাধনে প্রতিশ্রুত হইলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত দিন, জীবন থাকিবে, তত দিন, শিবজীর বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। শিবজীর আশা ফলবতী হইল। পন্তজী গোপীনাথ, শিবজীর বাক্‌চাতুর্য্যে মোহিত হইয়া, তাঁহার চিরসহচরের মধ্যে, পরিগণিত হইলেন।

পন্তজী গোপীনাথের পরামর্শে, আফজল খাঁ, শিবজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে উদ্যত হইলেন। শিবজী, প্রতাপগড় দুর্গের নিম্নে, একটি স্থানে, সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিলেন। তিনি, ঐ স্থানের জঙ্গল কাটাইয়া আফজল্ খাঁর আসিবার পথ পরিষ্কৃত করাইলেন। কিন্তু, পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের জঙ্গল, পূর্ব্বের ন্যায় রহিল; শিবজী, ঐ জঙ্গলে, আপনার সাহসী মাওয়ালী সৈন্য, সন্নিবেশিত করিয়া রাখিলেন। বিজয়পুরের সৈন্যগণ, উহার কিছুই জানিতে পারিল না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে, আফজল খাঁ, শিবজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে, যাত্রা করিলেন। তিনি, যুদ্ধবেশে সজ্জিত ছিলেন না, তাঁহার পরিচ্ছদ, মোটা মস্‌লিনের ছিল। পার্শ্বদেশে, কেবল একখানি তরবারি ঝুলিতেছিল। পনর শত সৈন্য, তাঁহার সঙ্গে আসিতেছিল, কিন্তু পন্তজী গোপীনাথের পরামর্শে, ঐ সকল সৈন্য, প্রতাপগড় দুর্গের কিয়দ্দূরে, অবস্থিতি করিতে

লাগিল। আফজল খাঁ, কেবল এক জন মাত্র সশস্ত্র সহচর লইয়া, পাল্কীতে, শিবজীর নির্দ্দিষ্ট গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এ দিকে, শিবজী, আপনার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ, লৌহ বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইল। ঐ বর্ম্মে, বৃশ্চিক ও ব্যাঘ্রনখ* সন্নিবেশিত রহিল। অপরে, না জানিতে পারে, এ জন্য, তিনি, বর্ম্মের উপর পরিষ্কৃত কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিলেন। এইরূপে সজ্জিত হইয়া, শিবজী, ধীরে ধীরে দুর্গ হইতে নামিয়া, যথোচিত শীলতার সহিত অভিবাদন করিতে করিতে, আফজল খাঁর সম্মুখবর্ত্তী হইলেন।

আফজল খাঁর ন্যায়, তাঁহার সঙ্গেও, একজন সশস্ত্র অনুচর ছিল। যথারীতি অভিবাদনের পর, শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া, উভয়ে, উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন অকস্মাৎ, আফজল খাঁর ভাবান্তর হইল। অকস্মাৎ, আফজল খাঁ, "ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা" বলিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আলিঙ্গনসময়ে, শিবজী আফজল খাঁর উদরে, বাঘনখ প্রবেশিত করিয়া দিয়াছি-

* বৃশ্চিক, বৃশ্চিকসদৃশ বক্র অস্ত্র। ব্যাঘ্রনখ, ব্যাঘ্রনখের আকার অস্ত্র।

লেন। যাতনায় অধীর হইয়া, আফজল খাঁ, শিবজীকে তরবারির আঘাত করিলেন। কিন্তু, শিবজীর কার্পাস-বস্ত্রের নিম্নে, লৌহবর্ম্ম থাকাতে, ঐ আঘাতে কোন ফল হইল না। এই সকল কার্য্য, নিমেষমধ্যে ঘটিল। নিমেষমধ্যে, শিবজী, অস্ত্রচালনা করিয়া,আফজল খাঁকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিলেন। আফজল খাঁর অনুচর, ইহা দেখিয়া, স্থির থাকিতে পারিল না! সে, অবিচলিত ধীরতা ও প্রভূত সাহসসহকারে, প্রভুহন্তা শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনুচর, এই যুদ্ধে অপরিসীম বীরত্ব দেখাইয়াছিল। কিন্তু, কিয়ৎকালমধ্যে, তাহারও পতন হইল। এই অবসরে, পাল্কীবাহকেরা, আফজল খাঁকে লইয়া, পলাইতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহাদের ঐ উদ্যম সফল হইল না। শিবজীর কয়েক জন সৈন্য, হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, আফজল খাঁর শিরশ্ছেদপূর্ব্বক, ছিন্ন মস্তক, প্রতাপগড়ে লইয়া গেল। এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র, মাওয়ালীগণ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া, বিজয়পুরের সৈন্য আক্রমণ করিল। বিপক্ষগণ, ইহাদের পরাক্রম সহিতে পারিল না। তাহারা, চারি দিকে পলায়ন করিল। শিবজী বিজয়ী হইলেন। মহারাষ্ট্রচক্রে তাঁহার প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হইল, তিনি, অবিলম্বে বহু সৈন্য ও বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

সহ্যাদ্রির পশ্চিমে, সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূখণ্ড, কঙ্কণ নামে পরিচিত। বিজয়পুরের সৈন্যের পরাজয়ের, পর, কঙ্কণ প্রদেশের অধিকাংশ শিবজীর হস্তগত হয়। ইহার পর, শিবজী কঙ্কণের পানেলাদুর্গ অধিকার করিতে উদ্যত হন। এই দুর্গ, বিজয়পুরের অধিপতির অধিকৃত ও দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শিবজী, পানেলা দুর্গের অধিকারেও, কৌশলের পরিচয় দেন। তিনি, আপনার কতিপয় প্রধান সেনানায়কের সহিত পরামর্শ করিয়া, ছলপূর্ব্বক তাহাদের সহিত বিবাদ করেন। ইহাতে, সেনানায়কগণ, অসন্তুষ্ট হইয়াই যেন, আট শত সৈন্যের সহিত, শিবজীর চাকরী পরিত্যাগ করিয়া, পানেলা, দুর্গাধ্যক্ষের নিকটে উপনীত হন। দুর্গাধ্যক্ষ, ইহাদের কৌশল বুঝিতে পারিলেন না, শিবজীর সহিত, ইঁহাদের অসদ্ভাব হইয়াছে, মনে করিয়া, হৃষ্টচিত্তে, ইঁহাদিগকে দুর্গে স্থান দিলেন। এ দিকে, শিবজী, অবিলম্বে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুর্গপ্রাচীরের সমান উন্নত কতকগুলি বৃক্ষ, প্রাচীরের সম্মুখে ছিল। শিবজীর যে সকল সর্দ্দার, দুর্গে স্থান পাইয়াছিলেন, একদা রাত্রিকালে, তাঁহারা, ঐ সকল বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া, বাহির হইতে শিবজী ও তাঁহার অনুচরদিগকে দুর্গের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া, দুর্গদ্বার খুলিয়া দিলেন। দুর্গ সহজে অধিকৃত হইল।

এইরূপ পুনঃপুনঃ জয়লাভে, শিবজীর এত দূর প্রতিপত্তি হইল যে, নানাস্থান হইতে হিন্দু সৈনিক পুরুষেরা আসিয়া, তাঁহার দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। বলবৃদ্ধির সহিত শিবজী, অধিকতর দুরূহ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যগণ, বিজয়পুরের ভূপতির অধিকৃত নানা-জনপদের লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ইহাদের উদ্যম, সাহস ও তেজস্বিতা বিচলিত হইল না। ইহারা, দেখিতে দেখিতে, বিজয়পুরের নগরপ্রাচীরের সম্মুখে আসিয়া, বিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল।

বিজয়পুরের ভূপতি ক্রুদ্ধ হইয়া, বশ্যতাস্বীকারের জন্য, শিবজীর নিকটে দূত পাঠাইলেন। দূত, শিবজীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। শিবজী, গম্ভীরস্বরে তাহাকে কহিলেন, "দূত! আমার উপর, তোমার প্রভুর এমন কি ক্ষমতা আছে যে, আমি, তাঁহার কথায় সম্মত হইব। শীঘ্র, এস্থান হইতে প্রস্থান কর, নচেৎ তোমাকে অপমানিত হইতে হইবে।" দূত চলিয়া গেল। বিজয়পুরের অধিপতি, শিবজীর এই উদ্ধত-ভাবের জন্য, অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, শাহজীকে কারা-রুদ্ধ করিয়া, কহিলেন, "তোমার পুত্র, শীঘ্র বশীভূত না হইলে, এই কারাগারের দ্বার গাঁথিয়া, তোমাকে জীবদ্দশায় সমাহিত করিব।" পিতার কারারোধের

সংবাদে, শিবজী কিছু শঙ্কিত হইলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যবিমুখ হইলেন না। কয়েক বৎসর পরে, বিজয়-পুররাজ, শাহজীকে ছাড়িয়া দিলেন। বিমুক্ত হইয়া, শাহজী, রায়গড়ে,আপনার এইরূপ দুরদৃষ্টের মূল—তনয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। শিবজী, পিতার সমুচিত সম্মান করিতে উদাসীন হইলেন না। তিনি, পিতাকে গদিতে বসাইয়া, তাঁহার পাদুকাগ্রহণ পূর্ব্বক সামান্য ভৃত্যের ন্যায়, পার্শ্বে, দণ্ডায়মান রহিলেন। বীরবর শিবজী, কিরূপ পিতৃভক্ত ছিলেন, তাহা, ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে।

শাহজী বিমুক্ত হইলে, শিবজী, পুনর্ব্বার আপনার আধিপত্যবিস্তারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এবার, বিজয়পুররাজ, শিবজীকে পরাজিত করিবার জন্য, বহুসংখ্য সৈন্য পাঠাইলেন একজন রণদক্ষ আবিসিনীয় সর্দ্দার, এই সৈন্যদলের অধিনায়ক হইলেন। বিজয়পুরের সৈন্য, শিবজীকে পানেলা দুর্গে অবরোধ করিল। কিন্তু, এবারেও শিবজীর জয় হইল। তাঁহার কৌশলে, আবিসিনীয় সর্দ্দারের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। বিজয়পুররাজ অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া, ঐ সর্দ্দারের প্রাণদণ্ড করিলেন।

যখন আওরঙ্গজেব,তাঁহার পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য, আগ্রায় যাত্রা করেন, তখন, তিনি,

শিবজীর নিকটে, কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সর্দ্দার পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু, শিবজী, আওরঙ্গজেবের ন্যায়বহির্ভূত কার্য্যের অনুমোদন করেন নাই, তাঁহার প্রার্থনাও গ্রাহ্য করিতে ইচ্ছুক হন নাই। তিনি, আওরঙ্গজেবের গর্হিত কার্য্যের কথা শুনিয়া, ঘৃণা ও বিরাগের সহিত, দূতকে বিদায় দেন। এই অবধি শিবজীর উপর, আও-রঙ্গজেবের প্রগাঢ় বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। এই অবধি, আওরঙ্গজেব, শিবজীকে "পার্ব্বত্য মূষিক" বলিয়া অভিহিত করিয়া, তাঁহার অনিষ্টসাধনে উদ্যত হন।

আওরঙ্গজেব, বৃদ্ধ পিতাকে রাজ্যচ্যুত ও কারা-রুদ্ধ করিয়া, স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এ দিকে, শিবজীর সহিত, বিজয়পুররাজের সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সময়ে, শিবজী, সমস্ত কঙ্কণপ্রদেশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাহার সাত হাজার অশ্বা-রোহী ও পঞ্চাশ হাজার পদাতিক সৈন্য হইয়াছিল।

বিজয়পুররাজের সহিত সন্ধিস্থাপনের পর, শিবজী মোগলরাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার আদেশে, তদীয় সেনাপতিগণ দিল্লীশ্বরের অধিকারের বিলুণ্ঠন করিয়া, পূনায় ফিরিয়া আসিলেন। শায়েস্তা খাঁ, এই সময়ে, দাক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব, শিবজীকে দমন করিবার

জন্য, তাঁহার প্রতি আদেশ দিলেন। এই আদেশের অনুসারে, শায়েস্তা খাঁ, বহু সৈন্য লইয়া, আওরঙ্গবাদ হইতে যাত্রা করিলেন। শিবজী, মোগলসৈন্যের আগমনসংবাদ শুনিয়া, রায়গড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহগড়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শায়েস্তা খাঁ, শিবজীর কৌশলের কথা জানিতেন। এজন্য, সাবধানে, আপনার আবাসগৃহ সুরক্ষিত রাখিলেন। তাঁহার অনুমতিপত্র ব্যতীত, কোন সশস্ত্র মহারাষ্ট্রীয়, পূনায় প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু, মোগল শাসনকর্ত্তার এ সতর্কতাতেও কোন ফল হইল না। চতুর শিবজীর সাহসে ও কৌশলে, সতর্ক মোগলের সর্ব্বনাশের উপক্রম হইল।

একদা, রাত্রিকালে পৃথিবী, ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। পূনার পথ, ঘাট, প্রাসাদ, সমস্তই যেন গভীর অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও জনসমাগম নাই, কেবল এক দল বিবাহযাত্রী, রাত্রির নিস্তব্ধতাভঙ্গ করিয়া, ধীরে ধীরে পূনার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সাহসী শিবজী, এই সুযোগে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে, সেনানিবেশ করিয়া, কেবল পঁচিশ জন অনুচরের সহিত, সেই বিবাহযাত্রীর দলে মিশিলেন। বরযাত্রীর দল, আমোদ করিতে করিতে, পূনায় প্রবেশ করিল, শিবজীও তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া, পূনায় উপ-

নীত হইয়া, একবারে আপনার বাসভবনে পঁহুছিলেন। শায়েস্তা খাঁ নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহার পরিবারের কয়েকটি স্ত্রীলোক, এই আকস্মিক আক্রমণের সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে জাগাইয়া দিল। শায়েস্তা খাঁ, শয়ন-গৃহের গবাক্ষ দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে, আক্রমণকারিগণের তরবারির আঘাতে, তাঁহার হস্তের একটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল। যাহা হউক, তিনি, কোন রূপে পলাইয়া, রক্ষা পাইলেন। কিন্তু, তাঁহার পুত্র ও অনুচরগণ, সকলে নিহত হইল। শিবজী জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া, বহুল মশালের আলোকে, যাইবার পথ উদ্দীপ্ত করিয়া, পুনর্ব্বার সিংহগড়ে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে, কতকগুলি মোগল অশ্বারোহী, সিংহগড়ের অভিমুখে আসিল। শিবজী, উহাদিগকে দুর্গের নিকটে আসিতে অনুমতি দিলেন। উহারা, মহাবিক্রমে, রণডঙ্কাধ্বনির সহিত নিষ্কোশিত তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে, দুর্গের সমীপবর্ত্তী হইল। তখন, শিবজী উহাদের সম্মুখে, কামান স্থাপিত করিলেন। উহারা, তোপের নিকটে তিষ্ঠিতে পারিল না, সন্ত্রস্ত হইয়া পলাইয়া গেল। শিবজীর এক জন সেনা-পতি পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, উহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। এই প্রথম বার, মোগলসৈন্য শিবজীর সৈন্যকর্ত্তৃক পরা-

ভূত ও তাড়িত হইল। শিবজী, বিজয়ী হইয়া, দক্ষিণা-পথে আত্মপ্রাধান্য অব্যাহত রাখিলেন।

ইহার পর, শিবজী অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া, সম্রাট আওরঙ্গজেবের অধিকৃত সুরট নগরলুণ্ঠন করিয়া, অনেক অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক, রায়গড়ে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি, জলপথেও আধিপত্যস্থাপনে যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি রণতরি ছিল। ঐ সকল রণতরি দ্বারা, মোগল সম্রাটের রণতরি অধিকৃত হইল।

শিবজী, সুরট নগর লুণ্ঠন করিয়া আসিয়া, শুনি-লেন, তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। পিতৃ-বিয়োগে, শিবজী সিংহগড়ে আসিয়া, শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর, রায়গড়ে উপস্থিত হইয়া, আপনার অমাত্যগণের সহিত, অধিকৃত জনপদের শাসন-প্রণালীর সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই কার্য্যে, কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। এই সময়ে, শিবজী "রাজা" উপাধির পরিগ্রহ পূর্ব্বক নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। মোগল সম্রাটের মহাপ্রতাপের মধ্যে, শিবজী, স্বাধীন রাজার সম্মানিত পদে অধিরূঢ় হইয়া, স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনায় উদ্যত হইলেন।

মক্কাযাত্রিগণ, সুরট বন্দরে আসিয়া, জাহাজে

উঠিত। এজন্য, ধর্ম্মনিষ্ঠ, মুসলমানগণের মধ্যে, সুরট পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। ঐ পবিত্র স্থানের বিলুণ্ঠন ও শিবজীর 'রাজা' উপাধির গ্রহণসংবাদে, আওরঙ্গজেব, ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার দমন জন্য, রাজা জয়-সিংহ ও দিলীর খাঁকে দক্ষিণাপথে পাঠাইলেন। কিন্তু, শিবজী, ইঁহাদের সহিত সম্মুখযুদ্ধে, প্রবৃত্ত হইলেন না। তিনি, সন্ধির প্রস্তাব করিয়া, প্রথমে রঘুনাথপন্থ ন্যায়-শাস্ত্রীকে জয়সিংহের নিকটে পাঠাইলেন। জয়সিংহের সহিত দূতের অনেক কথা হইল। দূত, বিদায় লইয়া, শিব-জীর নিকটে আসিলেন। শিবজী, বীরধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, সুতরাং কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া, অত্যল্প অনুচরের সহিত বর্ষার প্রারম্ভে, জয়সিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়া, আপনার পরিচয় দিলেন। জয়সিংহ, তাঁহাকে, অভ্যর্থনা করিয়া, আনিবার জন্য, এক জন সম্ভ্রান্ত লোক পাঠাইলেন। শিবজী, শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইলে, জয়সিংহ অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আপনার আসনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসা-ইলেন। সন্ধির নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া, দিল্লীতে প্রেরিত হইল। সম্রাট, সমস্ত নিয়মের অনুমোদন করিলেন। ইহার পর, শিবজী, মোগলের পক্ষে থাকিয়া, বিজয়পুরের বিরুদ্ধে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরবর্ত্তী বৎসর, তিনি, সম্রাটকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া, আপনার পুত্র, পাঁচ

শত অশ্বারোহী ও এক হাজার মাওয়ালী সৈন্যের সহিত দিল্লীতে যাত্রা করেন।

শিবজী, দিল্লীতে উপনীত হইলেন। দিল্লীর সমগ্র অধিবাসী, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু, আওরঙ্গজেব, দুর্ম্মতিপ্রযুক্ত, এই পরাক্রান্ত হিন্দুভূপতির যথোচিত সম্মান করিলেন না। তিনি, শিবজীকে আপনাদের প্রজাগণের সমক্ষে, অপদস্থ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

শিবজী, সম্রাটের সভাগৃহে সমাগত হইলে, আওরঙ্গ-জেব, আদর না করিয়া, তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম-চারিগণের আসনে বসাইয়া দিলেন। শিবজী, ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া, সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু, তিনি, তৎক্ষণাৎ দিল্লী হইতে প্রস্থান করিতে পারিলেন না। সম্রাট, তাঁহার বাসগৃহে প্রহরী রাখিতে, নগরের কোতোয়ালকে বলিয়া দিলেন। এ দিকে, চতুর মহা-রাষ্ট্রপতি, দিল্লীর জলবায়ু, সমভিব্যাহারী লোকের সহ্য হয় না বলিয়া, তাহাদিগকে স্বদেশে পাঠাইতে সম্রাটের নিকটে অনুমতি চাহিলেন। সঙ্গের লোক চলিয়া গেলে, শিবজী সহায়বিহীন, সুতরাং তাঁহার আয়ত্ত হইবেন ভাবিয়া, সম্রাট, তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন। ইহার পর, শিবজী পীড়ার ভাণ করিয়া, শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। অনন্তর, পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে

এই কথার ঘোষণা করিয়া, বৃহৎ বৃহৎ ঝুড়ী, মিষ্টান্নপূর্ণ করিয়া, ফকীরও সন্ন্যাসীদিগকে, ঐ মিষ্টান্ন দিতে লাগিলেন। এইরূপে, তাঁহার আবাসগৃহ হইতে মিষ্টান্নপূর্ণ বড় বড় ঝুড়ী বাহির হইতে লাগিল। যখন, প্রহরীদিগের সংস্কার জন্মিল যে, ঝুড়ীতে কেবল মিষ্টান্নই যাইতেছে, তখন সন্ধ্যার সময়ে, শিবজী, এক ঝুড়ীতে নিজে বসিয়া, ও আর একটিতে তাঁহার পুত্র শম্ভুজীকে বসাইয়া, বাসগৃহ হইতে বাহির হইলেন। নগরের উপকণ্ঠে অশ্ব সজ্জিত ছিল। শিবজী, সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া, শম্ভুজীকে আপনার পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া, তৎপর দিন মথুরায় উপনীত হইলেন। এই স্থানে, কতিপয় বন্ধুর নিকটে, শম্ভুজীকে রাখিয়া, স্বয়ং সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণাপথে আসিলেন। ইহার পর, তাঁহার বন্ধুগণও, শম্ভুজীকে লইয়া, দক্ষিণাপথে উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে, বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, পাছে, শিবজী, বিজয়পুররাজের সহিত মিলিত হন, এই আশঙ্কায়, আওরঙ্গজেব শিবজীকে এক জায়গীর দিয়া, তাঁহার "রাজা" উপাধি দৃঢ়তর করিলেন। ইহার পর, শিবজী বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে করগ্রহণ করেন।

কিছু দিনের জন্য, যুদ্ধের বিরাম হইলে, শিবজী, আপনার রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধান করেন। তিনি, রাজস্ব-সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য, ব্রাহ্মণের হস্তে দিলেন; কৃষক-দিগের উপর দৌরাত্ম্য না হয়, কেহ, কাহাকে প্রতারিত করিতে না পারে, তজ্জন্য, সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার নিয়মের অনুসারে, উৎপন্ন শস্যের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ, কৃষক পাইত, অবশিষ্ট দুই ভাগ, রাজকোষে যাইত। শিবজী, আপনার কর্ম্মচারী দ্বারা রাজস্বসংগ্রহ করিতেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি, সৈন্যদিগকে রাজকোষ হইতে বেতন দিবার নিয়ম করেন। তাঁহার পদাতিক সৈন্যের অধিকাংশই মাওয়ালীজাতীয়। তরবারি, ঢাল ও বন্দুক, ইহাদের প্রধান অস্ত্র। অশ্বারোহী সৈন্য "বর্গী" ও শিল্লীদার," এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। লুণ্ঠনে যাহা পাওয়া যাইত, তৎসমুদয় রাজকোষে জমা হইত। লুণ্ঠনকারীরা, কেবল উপযুক্ত পারিতো-ষিক পাইত। ১০ জন সৈন্যের উপর একজন নায়ক, ৫০ জনের উপর এক জন হাবিলদার ও ১০০ জনের উপর এক জন জুমলাদার থাকিত। এক হাজার পদা-তিক সৈন্যের অধ্যক্ষকে এক হাজারী বলা যাইত। পাঁচ হাজারীর উপর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ থাকিতেন।

পদাতিকদিগের ন্যায় অশ্বারোহী সৈন্যেরও শ্রেণী ছিল। ২৫ জন অশ্বারোহী সৈন্যের উপর হাবিলদার,

১২৫ জনের উপর জুম্‌লাদার ও ৬২৫ জনের উপর সুবা-দার ছিল। ৬,২৫০ জন অশ্বারোহীর অধ্যক্ষকে, পাঁচ হাজারী বলা যাইত। তরবারি, ঢাল ও বড়শা, অশ্বা-রোহীদিগের প্রধান অস্ত্র ছিল। ইহাদের অশ্বগুলি ক্ষুদ্রাবয়ব ও দ্রুতগামী হওয়াতে, ইহারা অনায়াসে, ত্বরিতগতিতে পার্ব্বত্য প্রদেশে গমনাগমন করিতে পারিত।

হিন্দুদিগের মতে, শরৎকালই দিগ্বিজয়যাত্রার সময়। প্রতাপশালী শিবজী,ঐ সময়ে, আড়ম্বরসহকারে দশভুজা দুর্গার পূজা করিয়া, দিগ্বিজয়ে বহির্গত হই-তেন। শিবজী, শত্রুদিগের অধ্যুষিত জনপদের লুণ্ঠন করিতেন বটে, কিন্তু কৃষক, গো অথবা স্ত্রীলোকদিগের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না।

আওরঙ্গজেব বাহিরে সৌজন্য দেখাইয়া, শিব-জীকে আর একবার হস্তগত করিতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু, তাঁহার ঐ চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। শিবজী, আওরঙ্গজেবের কৌশলজালে জড়িত হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণাপথের নানাস্থানে আধিপত্যবিস্তার করিতে লাগিলেন। সুতরাং, মোগল সম্রাটকে, এখন বাধ্য হইয়া, শিবজীর সহিত প্রকাশ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। শিবজী, ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, বা মোগলের আনুগত্য

স্বীকার করিলেন না। তিনি, প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় বীরধর্ম্মরক্ষায় যত্নশীল হইলেন। অবিলম্বে, মোগল সম্রাটের অধিকৃত কয়েকটি দুর্গে, বিজয়পতাকা স্থাপিত হইল। শিবজী, ইহার পর, পনর হাজার আশ্বারোহী সৈন্য লইয়া, আর এক বার সুরট নগরে উপনীত হইলেন। তিন দিন, নগর বিলুণ্ঠিত হইল। কেহই তেজস্বী মহারাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হইল না। শিবজী, অবাধে সুরটের ধনসম্পত্তির সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

শিবজী, যখন সুরট হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন দায়ুদ খাঁ নামক এক জন মোগল সেনাপতি, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হন। শিবজী, দায়ুদ খাঁকে আক্রমণ করিয়া, সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। এ দিকে, তাঁহার সেনাপতি প্রতাপ রাও, খান্দেশপ্রদেশে যাইয়া, নানা স্থান হইতে করসংগ্রহ করিতে থাকেন। শিবজীর এইরূপ প্রতাপ ও আধিপত্যে চিন্তিত হইয়া, আওরঙ্গজেব, তাঁহার বিরুদ্ধে, মহব্বৎ খাঁর অধীনে, চল্লিশ হাজার সৈন্য, দক্ষিণাপথে পাঠাইয়া দেন। শিবজী, এই সৈন্যের সম্মুখে আত্মপ্রাধান্যস্থাপনে বিমুখ হন নাই। তিনি, মরপন্থ ও প্রতাপ রাওনামক দুই জন প্রধান সেনাপতিকে, মোগল সৈন্যের

সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেন। এই সেনাপতি-দ্বয়ের আগমনসংবাদ শুনিয়া, মহব্বৎ খাঁ, ইখলাস খাঁর অধীনে, বহুসংখ্য সৈন্য, ইঁহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে, মোগল সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করে। তাহাদের অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাইশ জন সেনানায়ক নিহত হন। কয়েক জন সেনাপতি আহত হইয়া, বন্দিত্ব স্বীকার করেন।

মোগল সৈন্যের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের এইটি প্রধান সম্মুখযুদ্ধ। এই যুদ্ধে, শিবজীর সৈন্যগণ বিজয়লক্ষ্মীতে গৌরবান্বিত হয়। তাহাদের বিজয়িনী শক্তির মহিমা, চারি দিকে পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকে। শিবজী মহাপরাক্রান্ত ভূপতি বলিয়া, সাধারণের নিকটে সম্মানিত হন। তাঁহার প্রতাপ, তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার সমরচাতুরীতে, সকলেই বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে প্রধান বীরপুরুষ বলিয়া মনে করিতে থাকে। সম্রাট আওরঙ্গজেব, এই পরাক্রান্ত শত্রুর প্রভাবে স্তম্ভিত হন। এই যুদ্ধে, যে সকল সেনা-পতি বন্দী হইয়াছিলেন, শিবজী তাঁহাদের সহিত কোনও অসদ্ব্যবহার করেন নাই। তিনি, বন্দীদিগকে প্রভূত সম্মানের সহিত রায়গড়ে প্রেরণ করেন, তাঁহাদের ক্ষত স্থান ভাল হইলে, প্রভূত সম্মানের সহিত তাঁহাদিগকে বিদায় দেন। বীরপুরুষ, পবিত্র

বীরধর্ম্মের অবমাননা করেন নাই। আহত বন্দিগণকে রায়গড়ে,কখনও, কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। শিবজীর আদেশে, ইঁহাদের যথোচিত শুশ্রূষা হইয়াছিল। পতিত শত্রুর প্রতি এইরূপ সৌজন্য প্রকাশ করাতে, শিবজী, প্রকৃত বীরোচিত মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

শিবজী পূর্ব্বেই "রাজা" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। এখন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-গণের সহিত পরামর্শ করিয়া, শাস্ত্রের নিয়মানুসারে রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করেন। অভিষেককার্য্য-সম্পাদনের জন্য, গঙ্গাভটনামক এক জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বারাণসী হইতে রায়গড়ে উপনীত হন। ১৬৭৪ খ্রীঃ অব্দের ৬ই জুন, শিবজী, দুরারোহ শৈলশিখরবর্ত্তী রায়-গড়ে,রাজচক্রবর্ত্তীর সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হন। শাস্ত্র-পারদর্শী গঙ্গাভট্ট,এই দিনে,শিবজীকে যথাশাস্ত্র রাজ্যা-ভিষিক্ত করেন। ব্রাহ্মণগণ, এই উপলক্ষে অনেক ধর্ম্ম-সম্মত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে, মহোল্লা-সের তরঙ্গে, রায়গড়ে অপূর্ব্ব দৃশ্যের বিকাশ হয়। বীর-প্রবর শিবজী, রাজবেশে, রাজসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক, এই দিনের স্মরণার্থ একটি অব্দের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং রাজ্যসম্পর্কীয় উপাধি সকল পারস্য নামের পরিবর্ত্তে,সংস্কৃত নামে অভিহিত করিতে আদেশ দেন।

শিবজী রাজপদবী গ্রহণ করিয়া, যথানিয়মে রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। নর্ম্মদা হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত, দক্ষিণ ভারতবর্ষ, তাঁহার অধীন হইয়াছিল। তিনি, এই বিস্তৃত রাজ্যের শাসনে কখনও ঔদাসীন্য দেখান নাই। যুদ্ধজয়ে ও রাজ্যাধিকারে, তাহার যেরূপ ক্ষমতা ও কৌশল প্রকাশিত হয়, অধিকৃত রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধানেও, তাঁহার সেইরূপ ক্ষমতা ও কৌশলের বিকাশ হইতে থাকে। শিবজী, ইহার পরেও, নানাস্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সকল যুদ্ধেও, তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার সৈন্য-গণ, এক সময়ে, নর্ম্মদা নদী পার হইয়া, মোগল সম্রাটের অধিকৃত জনপদ আক্রমণ করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই। যখন মোগল সেনাপতি দিলির খাঁ, বিজয়পুরের অধি-পতিকে আক্রমণ করেন, তখন বিজয়পুররাজ শিব-জীর সাহায্যপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। শিবজী, সাহায্যদানে অসম্মত হন নাই। তাঁহার সমরচাতু-রীতে, দিলির খাঁ এমন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহাকে, অগত্যা বিজয়পুর পরিত্যাগ করিতে হয়। বিজয়পুরাজ, এজন্য ভূসম্পত্তি দিয়া, শিবজীর নিকটে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করেন।

এইরূপ নানাস্থানে, নানাবিষয়ে, আপনার অসামান্য সাহস, অপরিমিত ক্ষমতা ও অবিচলিত তেজস্বিতার

পরিচয় দিয়া, মহাবীর শিবজী, ক্রমে জীবনের শেষ দশায় উপনীত হন। তাঁহার হাঁটু ফুলিয়া উঠাতে, তিনি রায়গড়ে গমন করেন। ক্রমে প্রচণ্ড জ্বরের আবির্ভাব হয়। এই জ্বরের আর বিরাম হইল না। শিবজী জ্বরারম্ভের সপ্তম দিবসে, ১৬৮০ অব্দের ৫ই এপ্রেল, ৫৩ বৎসর বয়সে, ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

এইরূপে অসাধারণ বীরপুরুষের অসাধারণ ঘটনা-পূর্ণ জীবনের অবসান হইল। বীরপুরুষের সমস্ত কার্য্যই লোকাতীত ভাবে পরিপূর্ণ। ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাটও, তাঁহার ক্ষমতা ও প্রাধান্যরোধে সমর্থ হন নাই। যখন, তাঁহার মাওয়ালী সৈন্য, তাঁহার সমর-পটুতা, তাঁহার সাহস ও তাঁহার রাজ্যশাসনের কথা মনে হয়, তখন,তাঁহার প্রতি অপরিসীম প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। তিনি পিতার অজ্ঞাতসারে, বন্ধুজনের অনভিমতে, নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া,অভীষ্ট কার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে ক্ষণকালের জন্যও, তাঁহার মনে কোনরূপ আশঙ্কা বা উদ্বেগের সঞ্চার হয় নাই। তিনি, অপূর্ব্ব ক্ষমতা ও অধ্যবসায়বলে আপনার গুরুতর সাধনায় সুসিদ্ধ হন, এবং কৃতকার্য্যতায় গৌরবান্বিত হইয়া, অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপিত করেন।

অপরিসীম সাহস ও তেজস্বিতা থাকাতে, শিবজী,

সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতেন। তাঁহার ক্ষমতায়, সুশিক্ষিত মোগল সৈন্যও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে। বস্তুতঃ, সাহসে, কৌশলে ও ক্ষমতায়, তৎসময়ে তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁহাকে "পার্ব্বত্য মূষিক" বলিয়া ঘৃণা করিতেন। কিন্তু এই পার্ব্বত্য মূষিকের ক্ষমতায় দিল্লীর প্রতাপান্বিত সম্রাট এত দূর নিপীড়িত হইয়াছিলেন যে, অগত্যা তিনি, উঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। আওরঙ্গজেব শিবজীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কহিয়াছিলেনঃ—"শিবজী একজন প্রধান সেনাপতি ছিল, যখন আমি ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজ্যগুলি বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, তখন কেবল এই ব্যক্তিই একটি নূতন রাজ্য স্থাপিত করে। আমার সৈন্য, ঊনিশ বৎসর, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, তথাপি তাহার রাজ্যের কোন অবনতি হয় নাই।" আওরঙ্গজেবের কথাতেই শিবজীর ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

শিবজী শত্রুর অপকারী ছিলেন। কিন্তু, যাহারা পরাজিত ও বন্দীভূত হইত, তাহাদের প্রতি যথোচিত সৌজন্য দেখাইতেন। তিনি, আত্মীয়, স্বজন ও অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিতেন না। এইরূপ সদয় ব্যবহারে, সকলেই তাঁহার অনুরক্ত

থাকিত। মিতাচার তাঁহার একটি গুণ ছিল। অসাধারণ ক্ষমতাবলে অপরিমিত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইলেও, তিনি কখনও সৌখীনতার পরিচয় দেন নাই। তাঁহার নিকটে ভোগবিলাসের আদর ছিল না। তিনি, সামান্য বেশে ও সামান্য আহারপানে পরিতুষ্ট থাকিতেন।

শিবজী, দক্ষিণাপথে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার দৈর্ঘ্য চারি শত মাইল, বিস্তার এক শত কুড়ি মাইল। তিনি, তাঞ্জোরেও, আধিপত্যস্থাপন করিয়াছিলেন। নর্ম্মদা হইতে তাঞ্জোর পর্য্যন্ত, কঙ্কণ হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত, বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিপতিগণ, কোন না কোন সময়ে, শিবজীর সাহায্যপ্রার্থনা করিতেন। সকলেই, শিবজীকে কর দিয়া, সন্তুষ্ট রাখিতেন। সমগ্র দক্ষিণাপথে, তাঁহার অসীম প্রভুত্ব ছিল। দক্ষতায়, একাগ্রতায়, সত্বরতায়, তিনি, সকলকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। কেহই, তাঁহার কৌশলজাল ভেদ করিতে পারিত না, কেহই, তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হইত না, কেহই, তাঁহার ক্ষমতারোধে সাহস পাইত না। তিনি সময়ে সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যেহেতু, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বিশ্বাসঘাতকের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে, অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না।

শিবজী খর্ব্বকায় ছিলেন। তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল এবং মুখমণ্ডল সুগঠিত ও বীরত্বব্যঞ্জক ছিল। দেহের পরিমাণের অনুসারে, তাঁহার বাহুযুগলের দৈর্ঘ্য অধিক বোধ হইত। তাঁহার অনুরক্ত স্বদেশীয়গণ, তাঁহাকে দেবতার অবতার বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তিনি, আপনার তরবারির নাম "ভবানী" রাখিয়াছিলেন। ঐ তরবারি, সেতারার রাজার অধিকারে রহিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত, সেতারার রাজসংসারে, শিবজীর ভবানীর পূজা হইয়া থাকে।

পিতামাতার প্রতি ভক্তি।

পূর্ব্বকালে, অযোধ্যানগরে, দশরথনামক এক প্রতাপান্বিত ও প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। তাঁহার তিন মহিষীর নাম, কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার রাম, কৈকেয়ীর ভরত, এবং সুমিত্রার লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ননামক কুমার জন্মে। মহারাজ দশরথ, পুত্রচতুষ্টয়লাভে সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন। কুমারেরা যথাসময়ে, গুরুসন্নিধানে, নানা বিষয়শিক্ষা করিয়া, শস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া, খ্যাতিলাভ করিলেন।

মহারাজ দশরথ জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এজন্যে, তিনি, যৌবনদশায় উপনীত, জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে যৌব-

রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার অনুরোধে কুলপুরোহিত অভিষেকের আয়োজনে তৎপর হইলেন। এই সময়ে ভরত, শত্রুঘ্নকে লইয়া, মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কেবল লক্ষ্মণ, গুণজ্যেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ রামের নিকটে থাকিয়া, সর্ব্বান্তঃ-করণে, তাঁহার সন্তুষ্টিসাধনে তৎপর ছিলেন।

রাম, রাজা হইবেন শুনিয়া, পুরবাসীরা আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল অধীনস্থ রাজারা, রামের জয়-ঘোষণা করিতে লাগিলেন। নগরে নানা উৎসবের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। কিন্তু, পুরবাসীদিগের এই আহ্লাদ ও উৎসব দীর্ঘকাল থাকিল না। কৈকেয়ীর, মন্থরানামে এক কিঙ্করী ছিল। তাহার পরামর্শে, কৈকেয়ী, রামকে বনে পাঠাইয়া, স্বীয় পুত্র ভরতকে, রাজা করিবার জন্য, যত্নবতী হইলেন।

অনন্তর, মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ী, সমস্ত অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করিয়া, কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক ধরা-তলে শয়ন করিয়া রহিলেন। মহারাজ দশরথ, গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, প্রিয়তমা কৈকেয়ী, কোমল পর্য্যঙ্কের পরিবর্ত্তে, ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। তদ্দ-র্শনে, তিনি, দুঃখিত হইয়া, কৈকেয়ীকে ঐরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি প্রিয়তম পুত্র রামের নাম করিয়া, শপথ করিতেছি, তোমার যাহা

অভিলাষ, অসঙ্কুচিতচিত্তে তাহাই সম্পন্ন করিব।" মহারাজ দশরথ, এইরূপ বচনবদ্ধ হইলে, কৈকেয়ী, তাঁহাকে কহিলেন, "মহারাজ! আমার শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট হইয়া, পূর্ব্বে, আপনি, আমাকে দুইটি অনির্দ্দিষ্ট বর দিতে চাহিয়াছিলেন। এখন, আমি, এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, এবং অন্য বরে রামের চতুর্দ্দশবৎসর বনবাস প্রার্থনা করিতেছি। আপনি, আমার প্রার্থনা-পূরণে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এখন পূর্ব্বসত্যের পালন করিয়া লোকসমাজে, সত্যব্রত বলিয়া পরিচিত হউন।"

মহারাজ দশরথ, কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি, রামের বনবাসভিন্ন, অন্যবর লইতে, কৈকেয়ীর, অনেক অনুনয় করিলেন। কিন্তু কৈকেয়ী, অন্য কিছুই লইতে, সম্মত হইলেন না। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। পৌর ও জানপদবর্গ, প্রিয়-দর্শন রামের, অভিষেক দেখিবার জন্য, সভাগৃহে সমাগত হইতে লাগিল। এদিকে রাম, বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, অন্তঃপুরে, পিতার নিকট গমন করিলেন। দশরথ, নিতান্ত দীনভাবে কৈকেয়ীর সহিত পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে, রাম তথায় উপস্থিত হইয়া, অগ্রে পূজনীয় পিতার পাদবন্দনা করিয়া, পরে কৈকেয়ীর অভিবাদন করিলেন। দশরথ, রামকে দেখিয়াই, "রাম" এই নাম মাত্র উচ্চারণ করিয়া, অশ্রুপাত

করিতে লাগিলেন। আর, তিনি কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। রাম, সহসা পিতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, ভীত ও ব্যাকুল হইলেন। তিনি, কৈকেয়ীকে, পিতার এইরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৈকেয়ী কহিলেন, "রাম! রাজা মনে মনে কোন সঙ্কল্প করিয়াছেন; তোমার ভয়ে, তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। তুমি ইঁহার অতিশয় প্রিয়, তোমায় কোনরূপ অপ্রিয় কথা কহিতে ইঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। কিন্তু, মহারাজ, আমার নিকট, যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা, তোমার অনিষ্টকর হইলেও, তোমায় অবশ্যই, পালন করিতে হইবে। মহারাজ, সাক্ষাৎসম্বন্ধে তোমাকে কিছুই বলিবেন না। ইঁহার নিদেশে, আমি তোমাকে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিতে পারি।" রাম, কৈকেয়ীর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, "মাতঃ! আমি মহারাজের আদেশে অগ্নিপ্রবেশ ও বিষপান করিতে পারি। পিতা, পরমগুরু, ইনি, যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, বলুন। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অবশ্য তাহা রক্ষা করিব"। তখন কৈকেয়ী, মহারাজের সত্য ও নিজের বরপ্রার্থনার বিষয় উল্লেখকরিয়া, কহিলেন, "রাম! তুমি অদ্যই রাজ্যাভিষেকের লোভসংবরণ ও জটাবল্কলধারণ করিয়া, চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত, বনবাসী হও। মহারাজ, তোমার নিমিত্ত, যে অভি-

ষেকের আয়োজন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ভরতই অভি-
ষিক্ত হইবেন।”

পিতৃভক্ত রাম, এই কথায় কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না। তিনি পিতৃসত্যপালনে উদ্যত হইয়া, কৈকেয়ীকে কহিলেন, “দেবি! আমি অদ্যই, জটাবল্কল ধারণ করিয়া, বনে গমন করিব। দূতেরা, অদ্যই দ্রুত-গামী অশ্বে আরোহণ করিয়া, ভরতকে, মাতুলালয় হইতে আনিতে, যাত্রা করুক। আমি, এখনই পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য, অরণ্যে প্রস্থান করিতেছি। দেবি! আমি স্বার্থপর হইয়া, এই পৃথিবীতে বাস করিতে চাহি না। প্রাণান্ত করিলেও, যদি পূজনীয় পিতার আদেশরক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলেও, আমি তাহা করিব। পিতৃশুশ্রূষা ও পিতার আজ্ঞাপালন অপেক্ষা, জগতে মহৎ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। পিতা, আমাকে কোন কথা বলিতেছেন না, কেবল অধোমুখে অশ্রুপাত করিতেছেন। ইহাতে আমার মনে সাতিশয় কষ্টবোধ হইতেছে। আপনি, ইঁহাকে সান্ত্বনা করুন। আমি জননীর অনুমতিগ্রহণ ও জানকীরে সম্ভাষণ করিয়া, অরণ্যে যাত্রা করিতেছি। এক্ষণে, ভরত, যাহাতে রাজ্যপালন ও পিতৃশুশ্রূষা করেন, আপনি তাহাতে যত্নবতী থাকিবেন। পিতার সেবা করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম।”

পিতৃভক্তিপরায়ণ রাম, ইহা কহিয়া, পিতা ও মাতা-দিগকে অভিবাদন করিয়া, রাজ্য ও রাজপরিচ্ছদ পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক বনে যাত্রা করিলেন। সৌভ্রাত্রপ্রযুক্ত লক্ষ্মণ, তাঁহার সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। পতি-প্রাণা সীতাও পতিশুশ্রূষার জন্য, তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। অদ্য, যিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, তিনি পিতৃসত্যরক্ষার জন্য, জটাবল্কলধারী ও বনচারী হইয়া, পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। রাম, কেবল পিতৃ-ভক্তিপ্রযুক্ত, চতুর্দ্দশ বৎসর, কঠোর বনবাসক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। বনবাস, নিরতিশয় কষ্টকর মনে করি-য়াও, তিনি পরমারাধ্য জনকের প্রতি কখনও অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। কৈকেয়ীকে তাঁহার এইরূপ কষ্টের নিদানভূত জানিয়াও, তিনি তৎপ্রতি কোন রূপ অশ্রদ্ধাপ্রকাশে উদ্যত হন নাই। তাঁহার মুখ-মণ্ডল, সর্ব্বদা বিনয়নম্রতায় শোভিত থাকিত। তিনি জনকজননীর সমক্ষে কোনরূপ দুর্বিনীত ব্যবহারের পরিচয় দেন নাই। বনে প্রস্থানসময়ে, তিনি যথো-চিত ভক্তি প্রকাশপূর্ব্বক কৈকেয়ীর অভিবাদন করিয়া-ছিলেন। ভরত, যখন, তাঁহাকে অরণ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত করিবার জন্য, তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হন, তখন তিনি, তাঁহাকে, আরাধ্যা জননীদিগের শুশ্রূষা করিতে, বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন।

বোধ হয়, বিধাতা, লোককে পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও বিনয়, নম্রতা, সৌজন্য প্রভৃতি গুণগ্রামের শিক্ষা দিবার জন্যই, রামের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সৌভ্রাত্র।

ভরত, মাতুলালয় হইতে, অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া, দেখিলেন, নগরে কোনরূপ উৎসব নাই। নগরবাসীদিগের গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে, কেহ গৃহে নাই। রাজপথে, দেবালয়ে বা বিপণিতে, লোকসমাগম নাই। সকলই যেন, শূন্য রহিয়াছে। ভরত, এইরূপ অমঙ্গলচিহ্ন দেখিয়া, যার পর নাই শঙ্কিত হইলেন। তিনি অবনতবদনে পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু, পিতাকে সে স্থানে দেখিতে পাইলেন না; অনন্তর, মাতৃগৃহে যাইয়া, মাতার চরণবন্দনা করিয়া, সকলের কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন।

রামের বনবাসে ও আপনার রাজ্যলাভে, ভরত সুখী হইবেন ভাবিয়া, নির্লজ্জা কৈকেয়ী, তাঁহার নিকট সমুদয় বৃত্তান্তের বর্ণন করিয়া, কহিলেন, "বৎস! মহারাজ, প্রিয়পুত্র রামের শোকে দেহত্যাগ করিয়াছেন, এখন তুমিই রাজা হইলে; অতএব রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, যথানিয়মে প্রজাপালন কর।"

ভ্রাতৃবৎসল, সুশীল ভরত, পিতৃমরণ এবং রামলক্ষ্মণ ও সীতার নির্ব্বাসনের কথা শুনিয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে, এই গর্হিত কার্য্যের জন্য, জননীর যার পর নাই নিন্দা করিলেন। অনন্তর, ভরত, নিয়মিত দিবসে, পিতার শ্রাদ্ধাদিকার্য্য করিয়া, পবিত্র হইলে, বহুসংখ্য লোকে, তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে, অনুরোধ করিল। কিন্তু, ভরত তাহাদিগকে কহিলেন, দেখ, জ্যেষ্ঠের রাজা হওয়া, আমাদের কুলব্যবহার, অতএব, রাজ্যভারগ্রহণ করিতে, আমায় অনুরোধ করা, তোমাদের উচিত হইতেছে না। আর্য্য রাম, আমাদের জ্যেষ্ঠ, তিনিই রাজা হইবেন। আর, আমি অরণ্যে গিয়া, চতুর্দ্দশ বৎসর অবস্থিতি করিব। ভরত, ইহা কহিয়া, বহুসংখ্য সৈন্য ও রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকের সহিত, বনবাসী রামের নিকট, যাইবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে, অরণ্যযাত্রার সমস্ত আয়োজন হইল। ভরত, সকলের সমভিব্যাহারে, রামের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার চরণ ধরিয়া, রোদন করিতে করিতে, রাজ্যভার গ্রহণ করিতে কহিলেন। কিন্তু রাম, পিতৃসত্যরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, ভরতের কথায়, কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন ভরত, অগত্যা রামকে কহিলেন, "আর্য্য! আপনি পদতল হইতে পাদুকাযুগল উন্মুক্ত

করুন। আমি, সমস্ত রাজব্যাপার ঐ পাদুকাকে নিবেদন করিব, এবং আপনার ন্যায় জটাবল্কলধারণ ও ফলমূল ভোজন করিয়া, চতুর্দ্দশ বৎসর, নগরের বহির্ভাগে, আপনার প্রতীক্ষায় থাকিব। রাম সম্মত হইলেন। ভ্রাতৃবৎসল ভরত জ্যেষ্ঠভ্রাতার পাদুকাদ্বয় লইয়া, নন্দিগ্রাম নামক স্থানে যাইয়া, রাজ্যে, উহার অভিষেক করিলেন, এবং উহার সম্মানার্থে স্বয়ং ছত্রচামর ধারণ করিয়া রহিলেন। তিনি, সমস্ত রাজকার্য্য, অগ্রে ঐ পাদুকাকে জ্ঞাপন করিয়া, পরে যথারীতি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন, এবং সমস্ত উপহার অগ্রে ঐ পাদুকাকে নিবেদন করিয়া, পরে কোষাগারে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃবৎসল ভরত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি, এইরূপ শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণের কার্য্য, সৌভ্রাত্রের আর একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। লক্ষ্মণ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শুশ্রূষার জন্য, পিতা, মাতা ও স্ত্রীকে ছাড়িয়া, চতুর্দ্দশ বৎসর, তপস্বীর বেশে, বনে বনে বেড়াইয়াছিলেন। রাম ও সীতার সেবার জন্য, তিনি, কষ্টকে কষ্ট বলিয়া, মনে করেন নাই। লক্ষ্মণ, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপত্নীর ভোজনের জন্য, গভীর বন,হইতে, ফলমূল আহরণ করিয়া আনিতেন; তৃষ্ণাশান্তির নিমিত্ত, সুশীতল জল আনিয়া দিতেন;

রাত্রিতে, উভয়ে নিদ্রাভিভূত হইলে, ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া, কুটীরের দ্বারদেশরক্ষা করিতেন। সর্ব্বো-পায়ে, জ্যেষ্ঠের শুশ্রূষা করাই, তাঁহার একমাত্র ধর্ম্ম ছিল। তিনি, সর্ব্বান্তঃকরণে এই ধর্ম্মের পালন করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃশুশ্রূষায় তাঁহার অপরিসীম প্রীতিলাভ হইত। এই জন্য, তিনি শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে অরণ্যে বিচরণ করিয়াও, কখনও আত্মপ্রসন্ন-তায় জলাঞ্জলি দেন নাই। তাঁহার যেমন অসাধারণ বীরত্ব, তেমনই অলৌকিক ভ্রাতৃপ্রণয় ছিল। ভ্রাতার আদেশপালন করিতে পারিলেই তিনি চরিতার্থ হইতেন।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ, এইরূপ নানাবিষয়ে, সৌভ্রাত্রের পরিচয় দিয়াছিলেন। জগতে এরূপ সৌভ্রাত্র বিরল।

সত্যপ্রতিজ্ঞতা।

পূর্ব্বকালে কুরুবংশে, শান্তনুনামক এক পরম ধীমান্ ও পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর দেবব্রতনামে এক পুত্র জন্মে। দেবব্রত ক্রমে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইলেন। তাঁহার সত্যবাদিতা, জিতেন্দ্রিয়তাপ্রভৃতি গুণে, রাজ্যের সকলেই, তৎপ্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল।

মহারাজ শান্তনু, বন্ধুবান্ধবদিগকে অহ্বান করিয়া, উপযুক্ত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি, পুত্রের সহিত, পরম সুখে, চারি বৎসর অতিবাহিত করিয়া, এক দিন, মৃগয়ার জন্য, কোন অরণ্যে গমন করিলেন, এবং ঐ স্থানে দাসরাজতনয়া, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সত্যবতীকে দেখিতে পাইলেন। শান্তনু পুত্রান্তরকামনায় ঐ কামিনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়া, তদীয় পিতার নিকট, আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

দাসরাজ, শান্তনুর অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিল, "মহারাজ! এই কন্যার যে পুত্র জন্মিবে, আপনার অবর্ত্তমানে, সেই পুত্র, আপনার রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। আমার এই অভিলাষ পূর্ণ হইলেই, আমি আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি।" শান্তনু দেবব্রতের জন্য, দাসরাজের ঐ কথায় সম্মত না হইয়া, স্বীয় রাজধানী হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলেন।

অনন্তর, এক দিবস, দেবব্রত, পিতাকে চিন্তাকুল দেখিয়া কহিলেন, "তাত! আপনি সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর; রাজ্যের কোথাও কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে নাই, তথাপি আপনাকে নিরন্তর দুঃখিত ও চিন্তাকুল দেখিতেছি কেন? আপনার কি রোগ হইয়াছে? আজ্ঞা করুন, আমি উহার প্রতীকার করিব।"

পুত্রের কথা শুনিয়া, শান্তনু কহিলেন, "বৎস! আমাদের বংশে, তুমিই একমাত্র পুত্র; তুমি অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত ও সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছ। কিন্তু, মানুষের কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যদি তোমার কোন অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে, আমাদের কুল নির্ম্মূল হইবে। ধর্ম্মবাদীরা কহিয়া থাকেন, যাঁহার এক পুত্র, তিনি অপুত্রকের মধ্যে পরিগণিত। এই জন্য, আমার মন বড় অস্থির হইয়াছে।"

পিতৃভক্ত দেবব্রত, পিতার এইরূপ বিষাদের কারণ অবগত হইয়া, পরমহিতৈষী বৃদ্ধ মন্ত্রীকে সমস্ত জানাইলেন। মন্ত্রিবর দেবব্রতের নিকট, দাসরাজদুহিতা সত্যবতীর বৃত্তান্তের বর্ণন করিলেন। দেবব্রত, দাসরাজের নিকট যাইয়া, তাঁহার কন্যারত্নপ্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ, রাজকুমারের যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, "কুমার! আপনি মহারাজ শান্তনুর অনুরূপ পুত্র। মহারাজ, আমার কন্যাকে বিবাহ করিবেন, ইহা অতি গৌরবের বিষয়। কিন্তু, এই পরিণয় সম্পন্ন হইলে, রাজ্য লইয়া, আপনার সহিত ভয়ঙ্কর শত্রুতা জন্মিতে পারে। আপনি ক্রুদ্ধ হইলে, কাহারও নিস্তার নাই। উপস্থিত সম্বন্ধে, কেবল এইমাত্র দোষ দেখা যাইতেছে। নতুবা, এ বিষয়ে আর কোন আপত্তি নাই।"

সত্যনিষ্ঠ দেবব্রত, দাসরাজের এই কথা শুনিয়া, উত্তর করিলেন, "তুমি যাহা কহিবে, আমি তাহারই পালন করিব। যিনি, তোমার কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই আমাদের রাজা হইবেন।" ইহাতে দাসরাজ কহিল, "তুমি, উপস্থিত ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে যাহা কহিলে, তাহার কখনও অন্যথা হইবে না। কিন্তু, যিনি তোমার সন্তান হইবেন, তাঁহার প্রতি, আমার সন্দেহ হইতেছে। দেবব্রত, দাসরাজের বাক্যে কহিলেন, "আমি পূর্ব্বেই সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি, এখন প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব; যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, কখনও বিবাহ করিব না।"

দাসরাজ, দেবব্রতের প্রতিজ্ঞাবাক্য শুনিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিল, "এখন তোমার পিতাকে কন্যা সম্প্রদানকরা কর্ত্তব্য।" অনন্তর দেবব্রত সত্যবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মাতঃ! রথে আরোহণ করুন, আমরা গৃহে গমন করি।" পিতৃভক্ত দেবব্রত, এইরূপে সত্যবতীকে লইয়া পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ শান্তনু, পুত্রের এই দুরূহ কার্য্যে, সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন। সমাগত রাজগণ দেবব্রতের এইরূপ অসাধারণ প্রতিজ্ঞা ও স্বার্থত্যাগ দেখিয়া, মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন,

এবং উক্ত ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য, তাঁহাকে "'ভীষ্ম' বলিয়া" সম্বোধন করিলেন। মহানুভব দেবব্রত, অতঃপর ঐ 'ভীষ্ম' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর, মহারাজ শান্তনু যথানিয়মে পরম সুন্দরী সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। কালক্রমে, সত্যবতীর একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। মহারাজ শান্তনু, পুত্রলাভে অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, তাহার নাম চিত্রাঙ্গদ রাখিলেন। কতিপয় বৎসর পরে, শান্তনুর আর একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। ইনি বিচিত্রবীর্য্য নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বিচিত্রবীর্য্য তরুণ বয়স্ক না হইতেই, শান্তনু মানবলীলাসংবরণ করিলেন।

মহারাজ শান্তনু লোকান্তরিত হইলে, ভীষ্ম সত্যবতীর মতানুসারে, চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কিছু দিন পরে, চিত্রাঙ্গদ কোন এক যুদ্ধে নিহত হইলে, ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। এই সময়ে, বিচিত্রবীর্য্য, অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। ভীষ্ম, পরমযত্নে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তিনি, বিচিত্রবীর্য্যের সন্তানগণের প্রতিও, এইরূপ যত্নপ্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই।

· ভীষ্ম এইরূপ অটলভাবে আপন প্রতিজ্ঞার পালন করিয়াছিলেন, জীবিতকালের মধ্যে, কখনও দারপরিগ্রহ করেন নাই, এবং রাজ্যভার গ্রহণেও অগ্রসর হন্

নাই। তাঁহার ক্ষমতা ও বীরত্ব অসাধারণ ছিল। তিনি অনায়াসে আপনার ক্ষমতায়, পিতৃরাজ্যের অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু মহাবীর ভীষ্ম, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-ভয়ে, এরূপ কার্য্যে, হস্তক্ষেপ করেন নাই। প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য, তিনি, বিস্তীর্ণ রাজ্য, অপরিমিত ধন, অতুল রাজসম্মান, সমুদায়েই উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মশীলতা, নিঃস্পৃহতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও সত্য-প্রতিজ্ঞতা অতুল্য। তিনি, পরমারাধ্য জনকের সন্তোষ-সাধন জন্য, স্বার্থত্যাগী হইয়া অসাধারণ ধর্ম্মশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া অপূর্ব্ব নিঃস্পৃহতা প্রদর্শিত করিয়াছেন, কখনও স্ত্রীপরিগ্রহ না করিয়া, জিতেন্দ্রিয়তার একশেষ দেখাইয়াছেন, এবং অম্লানভাবে কঠোরপ্রতিজ্ঞার পালন করিয়া, অদ্ভুত সত্যপ্রতিজ্ঞতার সম্মানরক্ষা করিয়াছেন। একাধারে, এরূপ অসাধারণ গুণসমূহের সমাবেশ, প্রায় দেখা যায় না।

সম্পূর্ণ।